প্রয়াস

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

BlueRose ONE.com
Stories Matter
New Delhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Rajat Bandyopadhyay 2026

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7825-711-7

Cover design: Anuj
Typesetting: Tanya Raj Upadhyay

First Edition: June 2026

প্রাক্‌কথন

জীবনের প্রথম ছয় দশক ঘোরাফেরা করেছিলাম পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অলিগলিতে। তারপর চলে গিয়েছিলাম উত্তরভারতের ছোট, বড়, মাঝারি সব শহর, গ্রাম আর সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে। সেই ঘোরাফেরার অভ্যাসে সখ ছিল না, জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা ছিল। চলার পথে পরিচয় হয়েছে নানারকম মানুষের সঙ্গে, হরেকরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শী থেকেছি বহু ঘটনার। আমার বিশ্বাস, নিজেদের পারিবারিক নির্ভরশীলতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও এইসব মানুষজন, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিরাট একটা অবদান থাকে আমাদের গড়ে ওঠায়, আমাদের চিন্তাভাবনার, দৃষ্টিভঙ্গির নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক পরিবর্তনে। দুর্ভাগ্যবশত সেসবের বেশিরভাগই আমরা মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। হতে পারে এসবকিছুর নিঃশব্দ ভুমিকা বা অবদান আমরা অনুধাবন করতে পারি না। আমার নিজস্ব বৃত্তের বাইরে থাকা সেইরকম কয়েকজন মানুষ, কিছু অভিজ্ঞতা এবং রঙবেরঙের বিভিন্ন ঘটনার কথা সমষ্টিগতভাবে সবার সামনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এই বই একটি প্রচেষ্টা মাত্র। সংখ্যার হিসেবে অসংখ্য হবার কারণে সবাইকে এবং সবকিছুকে এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

*****

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গল্পের থেকেও বেশি গল্পগুলোর চরিত্র, ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত এবং অপরিচিতদের কাছ থেকে দাবি ছিল সবকিছু বইয়ের আকারে প্রকাশ করার জন্য। সেই দাবি পূরণ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল আমার স্ত্রী সঙ্ঘমিত্রা। প্রচ্ছদ চিত্রের ভাবনাটি তার। আমি কাগজের ওপর কলম বুলিয়ে উৎসাহদাতা মানুষজনের দাবিতে মান্যতা দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

BlueRose পাবলিশার্সকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলি প্রতি পদক্ষেপে পাশে দাঁড়িয়ে এই বই প্রকাশ না করলে আমার বৃত্তের বাইরে থাকা মানুষ, অভিজ্ঞতা এবং ঘটনাগুলি সদর্থেই হয়তো হারিয়ে যেত।

*****

সূচিপত্র

আমাদের বাড়ি..১
সেই বাড়িটা..৪
শিবু..৯
শ্রী অনাদি কুমার চ্যাটার্জী..১৭
অজানা ভালো মানুষেরা..২৫
একটি মেয়ের আখ্যান..৩৫
আয়াপলি..৪৪
ভ্যানিটি ব্যাগ..৪৯
সাতশ পাহাড়ের দেশে (১)..৫৩
সাতশ পাহাড়ের দেশে (২)..৬২
বউ..৭২
রাতবিরেতে পুকুরপাড়ে..৭৯
রাইমণি..৮২
ঋষি..৮৬
টোটকা..৯০
কঙ্কালীতলা..৯৬
ভুবনপুরের গল্পকথা..১০১
কর্কশ প্রান্তর..১১২

আব্দুলের মা ১১৮
স্বীকারোক্তি ১২৩
সাড়েপাঁচ ঘণ্টার গল্প ১২৯
পূরবী ১৩৬
চিলিকা (চিল্কা) ১৪৫
সরাইকেল্লা ১৪৯
কৌতূহল ১৫২
শীতের আমেজ ১৫৯
রাবণ ১৬৭
গুপ্তিপাড়া ১৭৩
অজিতদা, অনিলদা ১৭৯
রবীন্দ্রনাথ এবং আমার ছাত্রবেলা ১৮৩
শিরীষার গল্প ১৮৮
মোগল সাম্রাজ্যের পতন ১৯২
ভোলার বাবা ১৯৬
চম্বলের অতীত-কথা ২০১
ইচ্ছে কাহিনী ২১২

*****

আমাদের বাড়ি

আমাদের একটা বাড়ি ছিল।
তার তিনটে তলা ছিল।
সদরে তিনটে দরজা ছিল।
চার পাল্লার দরজা ছিল।
পাল্লাতে সব নক্সি ছিল।
লোহার টানা খিল ছিল।

ওপরে দুটো ছাদ ছিল।
ছাদের আগে ঘর ছিল।
জানলাগুলো রঙিন ছিল।
রামধেনু রঙ রোদ ছিল।
ঘরের শেষে রেলিং ছিল।
লোহার তৈরি রেলিং ছিল।
লতাপাতার কাজ ছিল।
তারপরেতে রাস্তা ছিল।
হরেকরকম দোকান ছিল।
একটু দুরে রেল ছিল।
রেলের ধোঁয়ায় কয়লা ছিল।

ছাদের পরে গাছ ছিল।
নিমগাছেতে বাঁদর ছিল।
গাছের ছায়ায় পুকুর ছিল।
মাছভর্তি পুকুর ছিল।
শান বাঁধানো ঘাট ছিল।
ঘাটে যাবার দরজা ছিল।
ওপারেতেও গাছ ছিল।
গাছের চূড়োয় চিল ছিল।
চিলের একটা বাচ্চা ছিল।

অনেকদুরে পাহাড় ছিল।
অল্পস্বল্প পাহাড় ছিল।
মধ্যিখানে ধু ধু ছিল।
ছাদের মাথায় আকাশ ছিল।
সকাল বিকেল পায়রা ছিল।
সারাদিনের রোদ ছিল।
আলসে চাঁদের রাত ছিল।

বাড়ির ভেতর উঠোন ছিল।
ধানের বড় গোলা ছিল।
চড়ুই পাখির বাসা ছিল।
খানিক দুরে শ্যাওলা ছিল।
সবার যাওয়া মানা ছিল।
এক পাশেতে কুঁয়ো ছিল।
কাচের মতো জল ছিল।

কুঁয়োর পাশে গলি ছিল।
গলির একটা দরজা ছিল।
পাল্লাদুটো লোহার ছিল।
ঘোড়ার খুরের নাল ছিল।

সবাই বলে ভুতও ছিল।
সেই কারণে ভয় ছিল।
ভুতেরা সব নিরীহ ছিল।
সব তলাতে শান্তি ছিল।

দুঃখ সুখ সবই ছিল।
অনেকজনের বাস ছিল।
লোকজনেরা ভালোই ছিল।
সবার জন্যে সবাই ছিল।

০৫/০৪/২০২৫

*****

সেই বাড়িটা

গত শতকের মোটামুটি ছয়ের দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের হাতে একটু পয়সাকড়ি জমলে তারা এখনকার মত ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট কিনতে দৌড়ত না। তার বদলে এরা সাধারণত পারিবারিক রাজমিস্ত্রীকে দিয়ে একটা বাড়তি ঘর বানিয়ে নিত অথবা টালির ছাদটা পাল্টে চূণ-সুড়কি দিয়ে ছাদ ঢালাই করে নিত, কিছু না হোক নিদেনপক্ষে পুকুরের ঘাট অথবা উঠোনের সিঁড়িগুলো বাঁধিয়ে নিত। এইসব প্রয়োজন মিটে যাবার পরেও যদি কিছু টাকাকড়ি হাতে থেকে যেত, তখন কিছুটা জমিজমা কিনে নেওয়ার সুযোগে থাকতো।

সেইরকম একজন মানুষ ছিলেন আমার প্রমাতামহ, আমার দাদামশায়ের বাবা। পেশায় ছিলেন স্বনামধন্য উকিল, অত্যন্ত ভালো পসার। হাতে বেশি জমলে মাইল দশেক দূরত্বের মধ্যে ধানজমি কিনে নিতেন, আর কম জমলে বাড়িতে একটা করে ঘর তৈরি করিয়ে নিতেন। প্রথমটার ক্ষেত্রে সমস্যা না থাকলেও, দ্বিতীয়টাতে সমস্যা ছিল। সেটা হল বাড়ির প্লটের আয়তকার আকৃতি। সামনেটা বড়জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ ফিট আর গভীরতায় ছশ ফিটের ওপর, সাতশ হতেও বা পারে। গিন্নিমায়ের আলো হাওয়ার সখ রাখতে সামনের বাড়ির এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে ঘরদোর আর পেছনের বাকি অংশটুকু একেবারে খোলামেলা। একতলায় উঠোন, ওপরের দুটো তলাতে দু-তিনটে করে ঘর আর খোলা ছাদ। বাড়ির পিছনের

বাকি জায়গা জুড়ে প্রায় দিঘি সাইজের একটা পুকুর। বাড়িটা ছিল তিনতলা। উচ্চতায় এখনকার প্রায় পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সমান। একতলায় রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, পূজোর ঘর, আঁতুড়ঘর, কাজের লোকের ঘর, অফিস, উঠোন, কুঁয়োতলা, কয়লা রাখার জায়গা, ভাঙে যাওয়া ব্যবহারের অযোগ্য জিনিসপত্র রাখার দরজাহীন খোলা চামচিকেতে ভর্তি এক গুদামঘর, তিনটে ধানের গোলা এবং একদম শেষপ্রান্তে পুকুরের দরজার পাশে এক কোনায় 'প'য়ের জায়গা। দোতলায় তিনটে ঘর। রাস্তার দিকে ফুট চারেক উঁচু, সুন্দর কারুকার্য করা লোহার রেলিং। আর ভেতরদিকে টানা বারান্দা। বারান্দার পরে অনেকটা খোলা ছাদ যার শেষপ্রান্তে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছাদহীন স্নানের জায়গা। তিনতলায় দুটো ঘরের সামনে খোলা ছাদ। সেইসময়কার অধিকাংশ বাড়িতে দুটো জিনিসের প্রাধান্য বা গুরুত্ব কম থাকত। প্রথমটা ছিল 'প'য়ের জায়গা, আর অপরটি ছিল সিঁড়ি। এই বাড়িতে আমাদের বড় হয়ে ওঠার বছরগুলো কেটেছিল।

সিঁড়ির ধাপগুলো এত উঁচু ছিল যে কখনোসখনো বিভ্রান্তি হতো সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠা করছি না কি কারুর বাড়ির পাঁচিল টপকাচ্ছি। এছাড়াও ছিল সিঁড়িতে উঠতে-নামতে আচমকা দু-একটা করে নব্বই ডিগ্রির অদৃশ্য মোড়, যাকে বলে ব্লাইণ্ড টার্ণ। ঐসব মোড়গুলোতে তখনকার প্রায় সব বাড়ির মত আমাদের বাড়িতেও একটা করে ঘুপচিমতো দুপাল্লার জানলা ছিল। গ্রীষ্মের নিঃঝুম দুপুরে একাএকা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় সিঁড়ির ঐসব কোন ভালোরকম গা ছমছমের জায়গা ছিল, আর সন্ধ্যের পর তো রীতিমতো গলা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হতো। আমরা ছোটরা আপ্রাণ চেষ্টায় থাকতাম সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা না করার। অনেক ছোটবেলায় সেই বাড়িতে

বড় হয়ে ওঠার জন্য আমাদের গিয়ে উঠতে হয়েছিল। আমাদের ভাইবোনদের সেই বাড়ির প্রকাণ্ডতা, সিঁড়িগুলোতে আচমকা সব শ্বাস-ভারী করা এদিক ওদিকের মোড়, বিশাল বিশাল উঁচু ঘরের সিলিং, অতদূরে 'প'য়ের জায়গা, সন্ধ্যে থেকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে জড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ কালো খোলা ছাদ, গোটা একতলা জুড়ে বিকেল থেকে শুরু হয়ে যাওয়া একটা সবসময়ের ঘাড়ের ওপর শরীর ভারী করা নিঃশ্বাসের শব্দ - এইসবের সঙ্গে ধাতস্থ হতে অনেক, অনেক সময় লেগেছিল। দোতলার ছাদের একেবারে শেষ দিকটা সূর্য ডোবার পর আর দেখা যেত না। ভোজবাড়ীর শেষ পাতে পানের মতন, সেখানটা ঢেকে রাখত পুকুড়পার থেকে উঠে আসা বিশাল আকৃতির এবং ছত্রাকার হয়ে আড়মোড়া ভাঙার কায়দায় দাঁড়িয়ে থাকা ঘন নিশ্ছিদ্র-সবুজ এক নিম গাছ। অন্তত শ-খানেক হনুমান সেই গাছটায় দিনের বেলায় থাকতো। ওরা আসতো নিমের ফল খেতে। আর শোনা যায় 'তারা' থাকতেন। অস্বস্তিকর পরিবেশ কয়েকগুণ বেড়ে যেত সন্ধ্যের পর। লোডশেডিংয়ের বদান্যতায় কেরোসিন লণ্ঠনের আলোর রমরমা ছিল। আর কেরোসিনের আলো মানেই আলো আঁধারির খেলা, লম্বা লম্বা কিম্ভুতকিমাকার ছায়া, যখন নিজের ছায়াকে নিজের সন্দেহ হয়। সব মিলিয়ে সন্ধ্যেটা হত সোনায় সোহাগা।

ধাতস্থ হতে আমাদের এতটা সময় লাগার একমাত্র কারণ হিসেবে শুধু প্রমাতামহের স্থাপত্যজ্ঞানকে দায়ী করা যাবে না, করলে সেটা ঘোর অন্যায় হবে। সত্যিকারের কারণ ছিল যারা, তাদের নাকি প্রায় কখনোই চোখে দেখা যেতে না, কখনো তাদের ছায়া পড়ত না। কখনোসখনো শুধুমাত্র অনুভব করা যেত। সবাই বলে তারা নাকি বাড়ি তৈরি হওয়ার আগে থেকে

সেই মাটির বাসিন্দা। কাউকে শুধু দোতলার সিঁড়ির একটা বিশেষ কোনাতেই দেখা যেত। তবে পুরোটা নয়, শুধুমাত্র তার বাঁহাতটা। তাই তার আনুমানিক বয়েস বা লিঙ্গের সম্বন্ধে কোনো সম্যক ধারণা করা সম্ভব ছিল না। একটু বয়স্ক, ধুতি আর বুশশার্ট পরা একজন মুণ্ডহীন লোককে মাঝেমধ্যে দোতলার বারান্দায় রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে পায়চারি করতে দেখা যেত। আবার রাতের শেষে ভোর শুরু হওয়ার সন্ধিক্ষণে কারোর চটি থেকে তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে চলে যাওয়ার ফটফট আওয়াজ অনেকে প্রায়দিন শুনতে পেত। ঝিরঝিরে বৃষ্টিঅলা, হাড়-দোমড়ান শীতগুলোর মাঝরাতে, কুঁয়ো থেকে জল তোলার আওয়াজ এবং তারপর মাথায় হড়হড় করে জল ঢেলে স্নান করার আওয়াজ দোতলা বা তিনতলায় মশারির ভেতর থেকে পরিষ্কার শোনা যেত। পাথরের দেশে জৈষ্ঠমাসের গরমে আমরা কেউ রাত্তির বেলা ছাদে শুতে চাইতাম না। কারণ 'তারা' ঐসময়টাতে সারারাত ধরে লাগোয়া পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরত। জাল ফেলার আওয়াজে ঘুমনো নাকি মুস্কিল হতো।

তিনতলার দুটো ঘরের মধ্যে একটা ঘর ছিল বাড়ির নববিবাহিতদের জন্য অথবা ভি.আই.পি. আত্মীয়স্বজনদের জন্য রিজার্ভ। ঐ ক্যাটিগরির মধ্যে কেউ না থাকলে তখন বাড়ির অন্যরা সেটা ব্যবহার করত, টেম্পোরারি ব্যবস্থায়। তবে এমনিতেই অন্যরা পারতপক্ষে তিনতলার ঘরে যেতে চাইত না, প্রধানত তিনটে কারণে। প্রথমত, সিঁড়ি ভাঙা আর পাহাড়ের ওঠার ফারাক বোঝা যেত না। দ্বিতীয়ত, ঐ ঘরে খাটের তলায় একটা ছোট্ট একটা লোহার মোড়ার ওপর প্রমাতামহের ব্যবহৃত চকচকে কালো রঙের চামড়ার তৈরী একজোড়া চটি রাখা থাকত। সেই চটি-জোড়া আবার কিছুদিন পর পর পালিশ

করানো হত। খাটে উঠতে নামতে পাদুকাদ্বয়ের নজর এড়ানোর কোনো উপায় ছিল না। বড়দের বলে কয়ে চটিজোড়া ঐ ঘর থেকে সরাতে আমাদের প্রায় বছর দশ-বারো লেগেছিল। তৃতীয় কারণটি ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। মাঝেমধ্যে রাত্তিরে ঘরের আলো জ্বালানোর পরে রেড্ অক্সাইডে পালিশ করা মেঝেতে ছোট বাচ্চার ভেজা পায়ের ছাপ দেখা যেত।

এরকম আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঘটনার কথা আমরা শুনেছিলাম, জেনেছিলাম। সবগুলো লিখতে গেলে সেটা জায়গা এবং সময় দুটোই জবরদখল করার সমান হবে।

সৌভাগ্যবশত, ওপরে লেখা অথবা না-লেখা অভিজ্ঞতাগুলোর কোনোটারই কোনোদিন আমরা ভাইবোনেরা প্রত্যক্ষদর্শী নই। সবগুলোই পরিবারের বড়দের কাছ থেকে শোনা। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী থেকেছেন।

সেই বাড়িটা আজ আর নেই। 'তারা' এখন কোথায় থাকে বা কোন পুকুরে রাত্তিরবেলা মাছ ধরে তাও জানা যায় না। তবে একটা কথা বলতেই হয় যে 'তারা', সে 'তারা' যারাই হয়ে থাকুক না কেন, ছোটদের প্রতি অত্যন্ত সহানভূতিশীল ছিল।

১২/০৮/২০২১

******

শিবু

বছর তিরিশ-বত্রিশ আগেকার মফস্বল শহরের এক শীতের সন্ধ্যে। ঘড়িতে সাড়েসাতটা কি আটটা। রাত তখন গভীর হওয়ার পথে। তিনতলা বাড়িটার উল্টোদিকের শিবমন্দিরে সন্ধ্যের আরতি শেষ হবার মুখে। ঠিক সেইসময়, কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই, দোতলার ঘরে ওর বাবার পালঙ্কে শুয়ে শিবু মারা গেল। টানাপোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল দুপুর থেকেই। শিবু কিছুতেই যাবে না, আর সেই অদৃশ্য নাছোড়বান্দা শক্তি ওকে নিয়ে যাবেই। রক্ত-সম্পর্কিতেরা, মানে শিবুর ছোড়দাদা, যাকে ও চিরকাল দাদা বলেই সম্বোধন করে এসেছে, বিধবা বড়গিন্নী, যাকে ও কোনদিন বড়বৌদি বলে সম্বোধন করেনি, কয়েকজন ভাইপো, ভাইঝি এবং সেই ছোট্ট শহরের বেশ কিছু পরিচিত এবং অপরিচিতরা মিলে গোটাতিনেক বালিশের ওপর হেলান দেওয়ানো শিবুর আধশোয়া শরীরটাকে চক্রব্যূহের মতো করে ঘিরে ধরে ওকে আগলে রাখার চেষ্টা করছিল। তবে অমোঘ সত্যের কাছে সেই রাত্তিরে ঐসব চক্রব্যূহ-ট্যূহ কোনো কাজে দেয়নি। শিবুকে যেতে হয়েছিল।

প্রধানত দুটো কারণে শিবুকে যেতে হলো। প্রথমটি অবশ্যই অসম প্রতিপক্ষ। আর দ্বিতীয়ত, গুরুত্বের বিচারে শিবুর কাছে এপারে থেকে যাওয়ার যুৎসই কোনো কারণ ছিল না।

এরপরের ঘটনাক্রম খুবই ছোট। পরের দিন ভোরের আগেই শিবুর অস্থি জঙ্গীপুরের গঙ্গায় বিসর্জন হয়ে গেল। তার দু-চার বছরের মধ্যে ওর দাদা ও বৌদি দুজনের গত হবার সাথেসাথে শিবুর মারা যাবার দিন, ক্ষণ, মাস, বছর, ওর অভ্যেস, বদভ্যাস, ওর গুণ, অগুণ ইত্যাদি ইত্যাদি এবং আরো অনেককিছু পুরনো ক্যালেণ্ডারের মত সবাই ভুলেও গেল।

ছয় ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল শিবু। ভাইবোনেদের মধ্যে একমাত্র বড়দাদা তার আচারে ব্যবহারে চিরকাল শিবুকে একজন মানুষের বদলে একটি সংখ্যা হিসেবেই গণ্য করেছে। তাই জ্ঞান হয়ে থেকে শিবু ওর বড়দাদাকে এড়িয়ে চলতো, এমনকি আড়ালে আবডালে নাম ধরেই উদ্দেশ্য করতো। এইকারণেই বড়বৌদি হয়েছিল বড়গিন্নি। শিবু তার ছোড়দাদাকে দাদা বলে ডাকতো। ছোড়দাদার বিয়ের সময় শিবু খুবই ছোট, সবে হাঁটতে শিখেছে অথবা শেখার চেষ্টা করছে এইরকম কিছু একটা। প্রথম থেকেই নতুন বৌদির খুব ন্যাওটা হয়ে গিয়েছিল। এই বৌদি ছিল মোটামুটি দ্বিতীয় মা, যদিও বৌদি বলেই ডাকতো। বাড়িতে লেখাপড়ার পরিবেশ ছিল বেশ হাল্কা ধরণের। শিবুও নিজেকে সেই স্রোতে ভাসিয়েছিল। কিন্তু একটা অবাক করা জিনিস, কাকতালীয় হলেও সত্যি ছিল, শেষসময় পর্যন্ত লেখাপড়ায় শিক্ষিত মানুষজনের প্রতি শিবু অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করেছে এবং শত্রুমিত্র নির্বিশেষে জনসমক্ষে তাদের আন্তরিক প্রশংসা করেছে।

বাবা-মায়ের অধিক বয়সের সন্তানদের ক্ষেত্রে যা হয়, শিবুরও তাই হয়েছিল। খুব অল্পবয়সে, তখন ইস্কুলের একেবারে নীচের দিকেই পড়ে, বাবা এবং মা দুজনকেই হারিয়েছিল। মা আগে,

বাবা পরে। বাবার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর কাছের, দূরের, সবরকমের এবং সবধরণের আত্মীয় পরিজনেরা যে যার নিজের নিজের জায়গায় একে একে ফিরে গেল। যাবার সময় সবাই ছোট্ট শিবুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল 'সাবধানে থাকিস'; কিন্তু শিবু কোথায় থাকবে সেটা কেউ বলে যায় নি। তবে দাদা, বৌদির কাছে শিবু ছিল তাদের সন্তানপ্রতিম। যাইহোক, সবকিছু দেখেশুনে শিবুরও একদিন ইচ্ছে হয়েছিল কোথাও একটা চলে যাবার। কিন্তু অল্পবয়সী বুদ্ধি দিয়ে কোথায় যাবে, কেমন করে যাবে, পয়সাকড়ি কোথায় পাবে এসব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। অবশেষে একদিন মরিয়া হয়ে অগতির গতি বৌদির কাছে, কারণ জানিয়ে পয়সা চেয়ে বসলো। উত্তর দিতে কিছুটা সময় নিয়ে খুব শান্ত ভাবে বৌদি বলেছিল কথাটা দাদাকে জানাবে। সেদিন রাতে শুতে গিয়ে বৌদি শিবুর অভিপ্রায়ের কথা দাদাকে জানিয়েও ছিল। দাদা অবশ্য নিজের বৌকে কোনো উত্তর-টুত্তর দেয়নি। পরেরদিন সকালে দাদার অফিসঘর থেকে বিরাশিসিক্কা ওজনের একটি থাপ্পড়ের আচমকা আওয়াজ অনেকে শুনতে পেয়েছিল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিবুকে ঐ ঘর থেকে নিজের গাল চেপে ধরে দৌড়ে বেড়িয়ে আসতেও দেখা গিয়েছিল। শোনা যায়, এই ঘটনার পরের কয়েক দিন ধরে শিবুর দাদা কাছারিতে বেরিয়ে যাওয়ার পরে সুখদা-ঝি হাল্কা করে চূণ-হলুদ লাগিয়ে লাগিয়ে শিবুর বাঁ গাল থেকে পাঁচ আঙুলের ছাপ তুলেছিল। আসলে কম বয়সের অপরিপক্কতার কারণে শিবু সেদিন ধারণা করে উঠতে পারেনি তার প্রতি দাদা-বৌদির সন্তানসম স্নেহের গভীরতার মাপ। সেটাই ছিল নিজেকে স্বাধীন করার শিবুর প্রথম এবং মোটামুটি শেষ প্রচেষ্টা। অবশ্য কবেকার সেই কোনো এক সকালের

প্রতিষ্ঠিত পাঁচ আঙুলের ছাপ শিবুর পঁয়ষট্টি বছরের জীবনকালের জন্য ভাল হয়েছিল না কি খারাপ হয়েছিল সে বিষয়ে তার উত্তরসূরীরা আজও সময় কাটাতে চা-কফির পেয়ালা হাতে তর্ক করে, আলোচনা করে।

শিবুর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরবর্তী সমস্তরকম প্রচেষ্টাগুলোর কোনোটাই কোনো না কোনো কারণে সফল হয়নি। তিতিবিরক্ত হয়ে একসময় চেষ্টা করাটাই ছেড়ে দিয়েছিল এবং তার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনের মধ্যে কোনোরকম আক্ষেপের আঁচড় পড়তে দেয়নি। যৌবন শুরুর সময় থেকে শুরু করে মন্দিরের আরতির সেই শেষ সন্ধ্যে পর্যন্ত এপারের সময়টা শিবু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কাটিয়ে গেছে। জীবনের কাছ থেকে অথবা অন্যের কাছ থেকে কোনো আশা বা চাহিদা করেনি। দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনগুলো একেবারে নিতান্তের পর্যায়ে রেখেছিল। মাথার ওপর ছাদ ছিল, জমিতে ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, এসবের চেয়েও বড় কথা মাথার ওপর দাদা-বৌদি নামের বটগাছটির ছায়া ছিল। সেই অর্থে আমাদের শিবু ছিল একজন নির্ভেজাল স্বাধীন পুরুষ। সেই স্বাধীনতা বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে সে উপভোগ করতো। সঠিক বয়সে আত্মীয়স্বজনেরা মিলে শিবুর বিয়ে দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করেছিল। শিবুরও একেবারে আপত্তি ছিল না, বরং বেশ উৎসাহ ছিল। কিন্তু কোথাও না কোথাও আটকে গিয়ে কোনো সম্বন্ধতেই শেষপর্যন্ত ছাতনাতলার মোহর পড়েনি। সে অবিবাহিত এবং স্বাধীন থেকে গিয়েছিল। শিবুর অবশ্য তাতে কিছু এসে যায়নি। মনে হয়, ওর বিচারে সাফল্য এবং অসাফল্য ছিল একই পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ। ওর কাছে জীবনটাই ছিল আসল।

নিত্যদিনের গতানুগতিক জীবনযাত্রা সকলের কাছে মাঝেমধ্যে একঘেয়েমি হয়ে আসে। শিবুরও আসতো। সেরকম মনে হলেই কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ নিয়ে রাত এগারোটার ডাউন গয়া প্যাসেঞ্জার ধরে সোজা কলকাতা চলে যেত। কলকাতায় পৌঁছে হ্যারিসন রোডের বহুদিনের পরিচিত একটা মেসবাড়িতে উঠতো। শিবুর নিজস্ব যে কলকাতা, সেটা ছিল খুব ছোট। সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড আর শিয়ালদহ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সেই কলকাতা। সারাদিন ঐসব অঞ্চল হাঁটতে হাঁটতে চষে বেড়াতো আর দোকানের সামনে শো-কেসে রাখা সবকিছু দেখে বেড়াতো। ক্লান্তি দূর করতে মেসে ফিরে এসে ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরে, এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে মেসের রকে গিয়ে বসতো আর চারদিকের সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। তবে প্রতিবার কলকাতার শেষ বিকেলটা বাঁচিয়ে রাখতো হাওড়া ময়দানের জন্য। বিকেলের দিকে সেখানে অনেকে আসতো তাদের পোষ্যদের নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে। শিবু ওখানে বসে চার বা আট আনার চিনেবাদাম খেতে খেতে বিকেলটা কাটিয়ে দিত। বিভিন্ন ধরণের কুকুর, তাদের আচার আচরণ, দৌড়াদৌড়ি, তাদের ট্রেণিং, খেলাধুলো এইসব কিছু খুব নিবিষ্টমনে খুঁটয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতো, দেখতো। সময়ের তাগিদ ওর কোনোদিন ছিল না, কারণ তাগিদ শব্দটাকে নিজের অভিধানে কোনদিন ঢুকতেই দেয়নি। তারপর সন্ধ্যে নামলে সারমেয় প্রভুরা যখন পোষ্যদের নিয়ে নিজেদের বাড়ির দিকে রওনা দিত, শিবু তখন হাঁটা শুরু করত হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। ষ্টেশনের বাইরে লাইন দিয়ে যে পাইস হোটেলগুলো ছিল, সেগুলোর কোনো একটাতে ঢুকে রুটি আর মাংস খেয়ে সোজা গিয়ে চার নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা আপ্ গয়া প্যাসেঞ্জারে উঠে পড়ত। জানলার ধারে বসে

অনেকক্ষণ ধরে তৃপ্তি করে একটা অথবা শীতের সময় হলে পরপর দুটো বিড়ি খেয়ে ওপরের বাঙ্কে উঠে ঘুমিয়ে পড়তো। পরেরদিন কাকভোরে বাড়ি পৌঁছে যেত পরবর্তী বেশ কয়েকমাসের জন্য একেবারে চাঙ্গা হয়ে।

শিবুর থাকতো তিনতলায়। যে ঘরটায় ওর ছিল সেটাকে মিউজিয়াম বলাই ভালো। ঢুকেই বাঁদিকের দেয়াল বরাবর কাঠের লম্বা বেঞ্চি। সামনের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দরজার দিকে মুখ করে রাখা বাপ-ঠাকুর্দার আমলের দুটো কাঠের ভাঙা হাতলওয়ালা চেয়ার। ডানদিকের দেয়াল ঘেসে শিবুর মেহগনি কাঠের পালঙ্ক। খাটটি এবাড়িতে এসেছিল সম্ভবত ওর মা-বাবার বিয়ের যৌতুক হিসেবে।

বেঞ্চি আর চেয়ারদুটোর ওপর ডাঁই করে রাখা থাকতো বিভিন্ন ধরনের বইপত্রের একটা ভাণ্ডার। উদাহরণস্বরূপ, সেখানে পাওয়া গিয়েছিল বাচ্চাদের ইস্কুলের কিছু পুরনো খাতা, প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর কয়েকটি ক্যালেণ্ডার, চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যেকার তিন-চারটে শুকতারা, কিছু পাঁজি, সাধকদের ওপর কয়েকটি বই, কোর্টকাছারি সংক্রান্ত মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা হলদেটে মুড়মুড়ে কিছু কাগজপত্র, ষাটের দশকের দু-একটা অমৃতবাজার পত্রিকা, গোটা দুই-তিন করে নবকল্লোল, রিডার্স ডাইজেস্ট আর উল্টোরথ। এসবগুলো শুধুমাত্র ওপর ওপর দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। নীচের দিকে আর সব কি ছিল সেগুলো খুঁজে দেখা হয়নি।

মেহগনির পালঙ্কে স্বাভাবিকভাবেই পাতা থাকতো নারকেল ছোবড়ার গদি, তার ওপর তোষক এবং চাদর। গদি আর তোষক যদি ওর মায়ের বিয়ের সময়কার হয় তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। পায়ের কাছে গুটিয়ে থাকতো শীতের লেপ।

মশারির উপযোগিতা নিয়ে শিবু যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করতো। ওর মতে মশার কাছে সারারাত মাথা নীচু করে থাকা একটা অর্থহীন ব্যাপার। পারিবারিক ইতিহাস বলে বাড়ির সবার নাকি মশারি ব্যবহার করা সত্ত্বেও অন্তত একবার করে ম্যালেরিয়া হয়েছিল, একমাত্র শিবু ছাড়া। তোষকের নীচে চোখ ছানাবড়া করে দেওয়ার মত সব জিনিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। খান দশেক পুরনো থেকে বহু পুরনো ট্রেনের টিকিট, গোটা পাঁচেক বিড়ি, দুএকটা খালি দেশলাইয়ের বাক্স, একটা রঙচটা চ্যাপ্টা লাইটার আর একটা মৃত হাতঘড়ি, বিড়ির আগুনে ফুটো হয়ে যাওয়া একটা রুমাল, সিমেন্ট বিক্রির ক্যাশমেমোর কয়েকটা কার্বনকপি, গাঢ় বাদামি হয়ে যাওয়া আলপিনের ফুটো সমেত পাসপোর্ট সাইজের নিজের একটা কম বয়সের ছবি, ক্যাপস্টান সিগারেটের চেপ্টে যাওয়া খালি প্যাকেট এবং হরেকরকমের আরও কত কীসব। পুরো ঘরটায় সেই অর্থে তিনটেমাত্র শৌখিন জিনিস ছিল। প্রথমটা ছিল পালঙ্কের ছত্রি জড়িয়ে নেমে আসা একটা বেড সুইচ, দ্বিতীয়টি ছিল মাথার দিকের জানলায় রাখা কাচের শিশিতে 'সুগন্ধি জবাকুসুম কেশতৈল'। আর তৃতীয়টি ছিল সাঁওতাল পরগনার চাঁদিফাটা গরমে ব্যবহারের জন্য বাদামি কাচের গগল্স, এখনকার পরিচয়ে সানগ্লাস।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমাদের শিবু ছিল অত্যন্ত উদার মানসিকতার মানুষ। যেরকম নিষ্ঠার সঙ্গে মন দিয়ে মুড়ি-ঘুঘনি খেয়ে নিত, সেই একইরকম নিষ্ঠার সঙ্গে পোলাও মাংসও খেত। আবার কিছু পদ খুব ভালো লাগলে মাঝেমধ্যে মাত্রতিরিক্ত পরিমাণে খেয়ে ফেলতো। সবচেয়ে পছন্দের খাবার ছিল সরস্বতী পূজোর সময়ে শীতলষষ্ঠীর গোটাসেদ্ধ। অস্বাভাবিক পরিমাণে খেয়ে তারপর দুদিন ধরে মুড়িমুড়কির

মত হজমের ওষুধ খুঁজে বেড়াতো। তাতে অবশ্য শিবুর বিন্দুমাত্র কিছু এসে যেত না। কেউ বকাবকি করলে বা সাবধান করলে শিবু উত্তর দিত "বছরে তো একটামাত্র দিন গোটাসেদ্ধ হয়"। হজমশক্তিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বছরের পর বছর এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটত। শিবুর একমাত্র অপছন্দের খাবার ছিল অনুষ্ঠান বাড়ির রান্না। কারণ ওর রসনায় সেইসব জায়গাগুলোতে রান্নার স্বাদ হতো "আখার ছাই", অর্থাৎ উনুনের ছাই, মানে অত্যন্ত খারাপ।

জ্ঞানী মানুষজনেরা বলেন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় দুবার। প্রথমে মৃত্যু হয় তার পার্থিব শরীরের। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হয় যখন সে পৃথিবীর স্মৃতি থেকে মুছে যায়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্র ষাট সত্তর বছর অথবা তারও বেশি সময় লেগে যায়। সেই অর্থে শিবুর দ্বিতীয় মৃত্যু হতে এখনো বহু বছর বাকি। এতসব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অবশ্য শিবুর কিছুই এসে যায় না। দুটো মৃত্যু একসঙ্গে যদি সম্ভব হতো, তাহলেও ওর কিছু এসে যেত না। শিবুর জীবদ্দশায় সবাই জানত শিবু আছে। আর বছর তিরিশ আগের সেই সন্ধ্যের শেষে সবাই জেনেছিল শিবু নেই। ব্যাস ঐ পযর্ন্তই। বেঁচে থাকা আর বেঁচে না থাকার মাঝে যে সীমান্তরেখা, তার এপারে এবং ওপারে, দুপারেই আমাদের শিবু একইরকম থেকে গেছে।

০৫/০৮/২০২৩

*****

শ্রী অনাদি কুমার চ্যাটার্জী

সেই কবে চারকুড়ি পেরিয়ে অনাদির বয়েস তখন নব্বইয়ের দোরগোড়ায়। বেশ কিছুদিন ধরে সে একধরণের অদ্ভুত দুর্ভাবনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে। ওর ধারণা হয়েছে যে চারপাশের লোকজন ওকে আগের মত আর সমীহ করছে না, ওর কথা কেউ শুনছে না, ওর সঙ্গে কোনো ব্যাপারে কেউ আলোচনা করছে না অথবা সাংসারিক বিষয়ে ওর কাছ থেকে মতামত নিচ্ছে না। বাড়ির লোকেরা বোঝানোর চেষ্টা করলে রাগ করে দিনকয়েকের জন্য একেবারে চুপ করে যায়। কয়েকদিন অন্তর অন্তর ভাবনাগুলো বারবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দিনের পর দিন ধরে এইরকম চলতে থাকায় কারোর মনে অনাদির মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে একটু আধটু সন্দেহ যে হয়নি তা বলা যাবে না। তবে এটাও সত্যি যে তার এখনকার এইসব চিন্তা অথবা সন্দেহগুলোর জন্য, সুদীর্ঘ জীবনে সহজ, কঠিন সবরকমের পথ পেরিয়ে আসা পোড়খাওয়া অনাদিকে এত তাড়তাড়ি অসুস্থ বলে ধরে নেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।

বছর ষাটেক বয়েস পর্যন্ত নিজের জীবনকে পুরেপুরিভাবে নিজে পরিচালনা করেছে। আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, অপরিচিত সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হৈহৈ করে দিন কাটিয়েছে। এইরকম এক পরিতৃপ্ত, নিশ্চিন্ত জীবনশৈলীর মধ্যে আচমকা একদিন ওপরঅলা সবকিছুর রাশ নিজের হাতে টেনে নিয়েছিলেন। তারপর থেকে অনাদির জীবনে

সবকিছু দিন আর রাতের মত ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। পুরনো জীবন অনাদি আর কোনোদিন ফিরে পায়নি।

বাড়ীর ফাইফরমাস-খাটা কমলা প্রতিদিন সকাল দশটা নাগাদ পরিবারের বড়মেয়েকে মাইলখানেক দুরের মিশনারি স্কুলের গেট অব্দি পৌঁছে দিত। সঙ্গে যেত চার বছরের অনাদি কমলার কোলে চেপে। দিদি গেট দিয়ে স্কুলে ঢুকে যাওয়ার পর গেটটাতে ঝুলে হাঁ হাঁ করে খানিক্ষণ কান্নাকাটি আর বায়না করতো দিদির সঙ্গে ভেতরে যাবার। তারপর কান্নায় ক্লান্ত হয়ে কমলার কোলে চেপে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাড়ী ফিরতো। উকিলবাবু বৈঠকখানায় ওদের ফেরার অপক্ষা করতেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তানের চুলে বিলি কাটার জন্য। বিলি কাটা হয়ে গেলেই অপেক্ষারত রফিকের টাঙায় চড়ে কাছারির উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন।

উকিলবাবু, অর্থাৎ অনাদির বাবা ছিলেন বীরভূম জেলার এক অজপাড়াগাঁয়ের হতদরিদ্র এক পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। সেই পরিস্থিতি থেকে উঠে এসে সম্পুর্ণ নিজ অধ্যাবসায়ে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন, হয়েছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং উদার মানসিকতার এক পূর্ণ পুরুষ। ওকালতি দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিলেন সমাজের একজন স্বনামধন্য, পরোপকারী এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ হিসেবে। সবার কাছে ছিলেন উকিলবাবু। পেশায় চরম সাফল্যের কারণে উপার্জন ছিল প্রভূত। খুব অল্পবয়সে প্রকাণ্ড এক বাড়ি করেছিলেন, বৈশিষ্টহীন চেহারার সাদামাটা এক বাড়ি। সেটিতে ছিল অসংখ্য ঘর, আর বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া ছিল বিশাল এক পুকুর। এছাড়া আশেপাশের ধানজমি যত পেরেছিলেন ন্যায্য দাম দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। নতুন বাড়িতে সংখ্যায়

অতগুলো ঘর তৈরি নিয়ে স্ত্রীর অনেক আপত্তি ছিল। উকিলবাবু কান দেননি। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা স্ত্রীকে বলেনও নি। বাড়ি তৈরী হয়ে যাবার পরে যেখানে যত দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের খোঁজ পেতেন, প্রত্যেককে তাদের পরিবারসমেত নিয়ে এসে একেকটা ঘরে রেখে দিতেন এবং তাদের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। পুকুরের মাছ আর জমির ধান সারা বছর পর্যাপ্ত খাবারের যোগান দিত। এই ব্যবস্থা চলতো যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি আশ্রিত পরিবারের অর্থনৈতিক সুরাহার কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা হত। সেটা মাসকয়েক থেকে ক্ষেত্রবিশেষে কয়েক বছরও হত। সবচেয়ে বড় কথা নিজের জীবদ্দশাতেই প্রতিটি পরিবারকে নিজেদের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য কোনো বাড়তি দায়িত্ব রেখে যাননি।

ভাইবোনেদের মধ্যে পড়াশোনায় মন এবং মেধা ছিল একমাত্র অনাদির। স্কুল পাশ করার পর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের সাথে আইন পরীক্ষায় পাশ করে। তারপর বাবার অ্যাসিস্ট্যণ্ট হিসেবে ওকালতিতে হাতেখড়ি হয়। বাবার মৃত্যুর পর সেই একই 'উকিলবাবু' নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে সমাজে। সৌখিন অনাদির লেটার প্যাডে ছাপা থাকত 'Shri Anadi Kumar Chatterjee, B.A., L.L.B.'। মেধা, জেদ এবং অধ্যাবসায়ের জোরে অতি অল্পবয়েসে ওকালতির পেশায় গগনচুম্বি খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশ, উপার্জন সবকিছুতে নিজের বাবাকে ছাড়িয়ে না গেলেও স্পর্শ অবশ্যই করে ফেলেছিল। বেশি পছন্দের ছিল ফৌজদারি মামলা অর্থাৎ ক্রিমিনাল কেস। ফৌজদারী মামলায় 'বুদ্ধির কসরৎ অনেক বেশি' এই দর্শনে ও বিশ্বাসী ছিল।

অনাদি ছিল সত্যিকারের একজন মিতাহারী। খেয়ে উঠে যাবার পরে থালা দেখে খেয়েছে কি খায়নি অনেকসময় বোঝা মুস্কিল হত। অন্যদিকে অদ্ভুতভাবে, ওর ভালোলাগার অভ্যেস ছিল লোকজনকে খাওয়ানোর। বাহারি খাবার নয়, সাধারণ বাড়ির রোজকার আটপৌরে খাবার। তাতে আনুষ্ঠানিকতা হয়ত থাকতো না, কিন্তু আন্তরিকতা থাকতো। অনাদির সেইরকম আন্তরিকতার দিনগুলোতে বাড়ীর হেঁসেলে কিন্তু সবার নাভিশ্বাস উঠতো। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পরেরদিন সকাল সাড়েদশটায় জেলাজজের কোর্টে মামলা উঠবে। আগের সন্ধ্যে থেকে সেদিন সকাল পর্যন্ত, মাঝে ঘুমের ঘণ্টা পাঁচেক ছাড়া, বৈঠকখানা ঘরে মক্কেলের জন্য দশ-বারো সাঙ্গোপাঙ্গোদের অনাদি সাক্ষী তৈরি করল। সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে কোর্টে যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার জন্য বাড়ির ভেতরে চলে গেল। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ভেতরদিকে মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল 'কেশব, এদের খেতে দিয়ে দে। অনেক দেরি হয়ে গেছে'। রান্নার ঠাকুর কেশব শুনতে পেল কি পেল না সেসব নিয়ে অনাদির কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। অবশ্য এটা অন্য কথা যে কেউ না কেউ শুনতে পেয়ে কেশবকে জানিয়ে দিত। আবার এতগুলো লোক যে সেদিন সকাল নটার সময় খাবে সেটাও সেদিনের সেই মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ জানত না, কেশব তো নয়ই। তারপর ঐটুকু সময়ের মধ্যে গিন্নিমা আর কেশব মিলে কিভাবে কি করত সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে এটা জানা যায় যে ঐ দশবারোজন লোক গরমগরম মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে সময়মতো জজসাহেবের সামনে হাজিরা দিত। সেইরকম সব দিনগুলোতে অনাদি দলবল নিয়ে কাছারি বেরিয়ে যাবার

পরের ঘণ্টাখানেক অন্দরমহল ভরে যেত যুদ্ধশেষের নিস্তব্ধতায়।

পঞ্চাশ ছুঁয়ে অথবা বোধহয় ছোঁয়ার কিছু আগেই দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে অনাদির জীবন হয়ে গিয়েছিল মুক্ত বিহঙ্গের মত। বাড়িতে শুধু সে, তার স্ত্রী আর অবিবাহিত ছোট ভাই। সেই ভাইয়ের কথা আগে অন্য জায়গায় লিখেছি। আর থাকত জনপাঁচেক কাজের লোক। অনাদি সারাদিন চুটিয়ে ওকালতি করে। কাছারি থেকে ফিরে বৈঠকখানা ঘরে রাত এগারোটা অব্দি স্কুলের সময়কার চারপাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে দিগ্বিবিদিক জ্ঞ্যানশূন্য হয়ে ব্রিজ খেলে। কেশব গাওয়া ঘিয়ে ভাজা সিঙাড়া ঘনঘন সামনে এনে রাখত, সঙ্গে অবশ্যই চা। এসবের বাইরে পেশাতে অল্প অবকাশের সুযোগ পেলেই গিন্নিমাকে সঙ্গে নিয়ে রাতের ট্রেন ধরে অনাদি চলে যেত যে কোনো একজন মেয়ের কাছে, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সময় কাটাতে।

শহরের ভেতরে এবং আশেপাশে খুব ভালো জাতের ল্যাংড়া আর বোম্বাই আমের কয়েকটা বিশাল বাগান ছিল। ছোট জায়গা বলে বাগানমালিকরা সবাই পরিচিত। গরমের ছুটিতে কাছারি বন্ধ হয়ে গেলে অনাদি সেইসব বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে একেকটা গাছ থেকে একটা একটা করে আম পছন্দ করত। বাগানের লোকেরা সেই পছন্দের আমগুলো বোঁটা আর পাতা সমেত পেড়ে ঝুড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিত। পরের দিন ভরদুপুরে গরমের ক্লান্তিতে বাড়ি নিঃঝুম হয়ে গেলে গিন্নিমা সেই ঝুড়িগুলো থেকে এলোমেলোভাবে কয়েকটা আম বার করে নিতেন। তারপর বারান্দার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে একেকটি চিরকুটে একেকজন নাতি বা নাতনির নাম লিখতেন। নাম লেখা চিরকুটগুলো একটি একটি করে

আমের বোঁটায় সুতো দিয়ে নিজের হাতে বেঁধে দিতেন। অনাদিও কয়েকটা চিরকুটে তাদের নাম লিখে দিত। দুএকটা চিরকুটে আবার নামের নীচে লিখে দিত 'এটা পরের বছর খাবে' কিংবা 'এটা খেলে দাঁতে পোকা হবে' এইসব। তারপর সেইসব ঝুড়ি রেলের পার্সেলে বুক করে মেয়েদের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। নাতি-নাতনিরা চিঠি লিখে দাদু-দিদাকে জানাতো কে কটা নিজের নাম লেখা আম পেয়েছে। সেই হিসেব মিললে তবেই খেলার বৃত্তটা কমপ্লিট হত। এটা ছিল দাদু-দিদা আর নাতি-নাতনিদের মধ্যে নিয়মিত গ্রীষ্মকালীন খেলা। ওকালতি, ব্রিজ আর নাতি-নাতনিদের বাইরে সময় পেলেই আরেকটা নেশাতে অনাদি কাবু থাকত। সেটা ছিল ঘন্টার পর ঘণ্টা আড্ডা। এসবের মধ্যেই পেশাগত চ্যালেঞ্জকে আরও সম্পৃক্ত করার জন্য অনাদি আস্তেআস্তে সব ধরণের মামলা নেওয়া কমিয়ে দিয়ে বেশিটাই বড় বড় ফৌজদারি মামলা নেওযা শুরু করেছিল। সেখানেও সে দক্ষতার মাপকাঠিতে অকল্পনীয় সফলতা অর্জন করে।

মসৃণভাবে গড়িয়ে চলা অনাদির সেই সুন্দর জীবনের রাশ ওপরঅলা আচমকা যেদিন নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন অনাদি তখন ষাটের কাছাকাছি। 'মেয়ে বিদায়ের' ষোল বছর পর বড়মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, তার পরিচয় থেকে সধবার চিহ্ন সদ্য মুছে যাবার পর। সঙ্গে ছোট ছোট নাতি-নাতনি।

অনাদিকে সবকিছু আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছিল। নিজের আত্মবিশ্বাস আর জেদের ওপর ভরসা রেখে পরিস্থিতির সামনে ও কিন্তু ঝুঁকে পড়েনি, বরং বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাঝের কয়েকবছরের পরিতৃপ্ত জীবনটাকে

ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল দৃষ্টিসীমানার একেবারে বাইরে। অতীতের অনাদি আর এখনকার অনাদির মধ্যে নির্মাণ করে নিয়েছিল এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। দ্বিতীয়বারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল শুধু নিজের নয়, নতুন করে অনেকগুলো জীবন তৈরি করার তাগিদে। পিঠে হাত রেখে সর্বক্ষণ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন গিন্নিমা। বিশেষত্বহীন, ছোট্ট সেই মফস্বলের প্রতিটি মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনাদির সাথে দাঁড়িয়েছিল, একেবারে শেষ পর্যন্ত। কাণ্ডারীর মতো সংসারের হাল ধরে নাতি নাতনীদের লেখাপড়া শিখিয়েছিল, স্বাবলম্বী তৈরি করেছিল, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে তাদের নিজস্ব পৃথিবী তৈরি করে দিয়েছিল।

সারাজীবনের চড়াই উতরাই পেরিয়ে এসে অনাদি তখন ক্লান্ত। একটা জীবনকালে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই মেরুর দু-দুটি জীবনের দায়িত্ব মেটাতে ওপরঅলাকে কোনদিন দোষ দেয়নি, বরং তাঁর আশীর্বাদেই আশ্রিত থেকেছে।

বাড়ি এখন দ্বিতীয়বারের জন্য খালি হয়ে গেছে। বহুবছরপরে বাড়িতে আবার শুধু সে আর গিন্নিমা। গিন্নিমা এখন পুরোপুরি শয্যাশায়ী। ছোটভাই অনেক আগেই ফিরে যাবার জায়গায় ফিরে গেছে। কেশবরা কেউ নেই। ব্রিজ খেলার জন্য মাঝেসাঝে মন ছটপট করলেও সম্ভব হয় না। খেলার সঙ্গীদের অনেকে নিজেদের বরাদ্দ সময়শেষে ফিরে গেছে। বড়মেয়ে তার নাতি-নাতনিদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছাদে বা বারান্দায় কখনো একটু পায়চারি করার ইচ্ছে হলেও যেতে পারে না। এই বয়সের ইচ্ছেগুলোর দায়িত্ব শরীর আর নিতে পারে না। আড্ডার সঙ্গীদের মধ্যে কেউই প্রায় এখন আর

নেই। যেকজন আছে, বয়েস আর শরীর তাদের সবাইকে নিজের নিজের বাড়িতে বন্দি করে নিয়েছে।

আসলে, প্রত্যন্ত সেই মফস্বল শহরের উকিলবাবু, শ্রী অনাদি কুমার চ্যাটার্জী, বি.এ., এল.এল.বি., নিজের জীবনের পূর্ণচ্ছেদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসুস্থ নয়, একা হয়ে পড়েছে।

২৭/১১/২০২৪

****

অজানা ভালো মানুষেরা

চাকরিসূত্রে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে আমার কেটেছে সবমিলিয়ে মোটামুটি পনেরো ষোলো বছর। পূর্ব ভারতের অত্যাধুনিক শহর থেকে শুরু করে, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের উত্তপ্ত বছরগুলো মধ্যে দিয়ে আমরা চলে গিয়েছিলাম শের শাহের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং বাস্তবায়িত জি টি রোডের ওপারে। উত্তর বিহার সম্পূর্ণ অন্যরকম, একবারে আলাদা। সেই নতুন জীবনশৈলীর সঙ্গে মিশে গিয়ে সেখানকার বছরগুলো আমরা কাটিয়েছ্লাম। এতদিনের এতোরকম অভিজ্ঞতা কাগজেকলমে বেঁধে ফেলার ইচ্ছে থাকাটা খুব লোভনীয় এবং স্বাভাবিক। কিন্তু সেগুলো এতোই বহুবিধ এবং বহুমাত্রিক যে তারজন্য একজন বেদব্যস অথবা কৃত্তিবাসের প্রয়োজন, যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিজস্ব এই অপ্রতুলতার কথা মাথায় রেখে দু-তিনটি অভিজ্ঞতার কথা সকলের সঙ্গে আজ ভাগাভাগি করে নেওয়ার চেষ্টা করব। অভিজ্ঞতা অর্জনের স্থান

পশ্চিমী চম্পারণ জেলার তিনটি মহকুমা - নারকাটিয়াগঞ্জ, বেতিয়া, বাগ্‌হা। কম্পাসের কাঁটার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে বিহার রাজ্যের একেবারে উত্তর পশ্চিম কোণের সীমান্তবর্তী জেলা, পশ্চিমী চম্পারণ। সীমানার অপরদিকে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলা। সীমানা বরাবর বেশ কিছুটা অংশ দিয়ে বয়ে গেছে গণ্ডক নদী। এই নদীর জন্মস্থান তিব্বতে, প্রায় ছাব্বিশ হাজার ফিট উচ্চতার ন্যুহ্‌-বি-গে হিমবাহ থেকে। জন্মনাম

কালি গণ্ডকি। সেখান থেকে নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রবেশ করে নাম নেয় নারায়ণী। তারপর বিহারের বাল্মিকীনগর দিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করে। নতুন নামকরণ হয় গণ্ডক। বাল্মিকীনগর থেকে প্রায় পৌনে তিনশ কিলোমিটার বা একশ সত্তর মাইল মত বয়ে গিয়ে পাটনার কাছে হাজিপুরেক গঙ্গায় মিশে যায়। এই গণ্ডক নদীর ওপর উত্তর-পশ্চিম বিহারের চাষাবাদ বহুলাংশে নির্ভরশীল।

উচ্চারণের বিবর্তনে বাগ্‌হা নাম কবে যে বাঘা হয়ে গেছে কেউ জানে না। বাগ্‌হা পৌঁছতে হয় বেতিয়ার ওপর দিয়ে একই রাস্তা ধরে। নারকাটিয়াগঞ্জ অন্যদিকে। কাজের জন্য বহুবার বাগ্‌হা যেতে হয়েছে শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সবরকম ঋতুতে। দূরত্ব এবং সমসাময়িক আনুষঙ্গিক কারণে ঐ অঞ্চলে যেতে সবারই একটু দোনামনা ছিল। খুব একটা জরুরি কাজ না থাকলে সবাই ওখানে যাওয়াটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত। আমাদের অফিসের সবসময় জরুরি কাজই পড়ত। সেইসব কাজ সামলানোর দায়িত্ব ছিল দুজনের ওপর। আমি ছিলাম সেই দুজনের একজন। পাটনা থেকে বিকেলের দিকে রওনা হয়ে গঙ্গার ওপর গান্ধীসেতু পার হয়ে ষাট কিলোমিটার দূরে মুজফ্‌ফরপুর। সেখানে রাত্রিবাস। পরেরদিন সকালে বেরিয়ে যেতাম বাগ্‌হার উদ্দেশ্যে। দুশো কিলোমিটার যাত্রা শেষ করে অন্ধকার হওয়ার আগে কোনওবার পৌঁছতে পারিনি। যাত্রাপথে প্রথম আসতো কাঁটি। একসময় এখানে নীলচাষ হত। এখন এন.টি.পি.সির পাওয়ার প্ল্যাণ্ট আছে। পরপর আসতো মেহদি, চাকিয়া, পিরানকোঠি, ছাপওয়া, মাধোপুর এবং তারপর আসতো বড় শহর, ডিষ্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার - বেতিয়া। বেতিয়াতে বারদুয়েক রাত কাটিয়েছি। তেরশ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গেশ্বর দেব নামে একজন ব্রাহ্মণ এখানে বসবাস শুরু

করেন। কোথা থেকে এসেছিলেন বা কেনো এসেছিলেন জানতে পারিনি। তাঁর বংশধররা ভৌগলিক এবং সামাজিক - দুদিকেই পারিবারিক স্থিতি এবং আধিপত্য বিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নরকম জনকল্যাণমুলক কাজ করতে থাকেন। সন্তুষ্ট হয়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এঁদের 'রাজা' উপাধিতে ভুষিত করেছিলেন। এখানকার রাজবাড়ি একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। প্রায় দেড়শ বছর আগে বেতিয়ার রাজা খ্রিষ্টান মিশনারিদের এখানে এনে বসতি স্থাপন করে দিয়েছিলেন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য। তবে জানুয়ারির এক ঝড়বৃষ্টির রাতে বেতিয়াতে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লে এখনও হাতে পায়ে অবশ হয়ে আসে। সে কাহিনী যেহেতু আজকের বিষয় নয়, তাই অন্য কোনোসময় শোনানোর চেষ্টা করবো। বেতিয়া পেরিয়ে আরম্ভ হতো দুদিকে ধান আর আখের ক্ষেত, সুগারকেন্ ফ্যাকট্রি (আখের রস থেকে চিনি তৈরীর কারখানা)। আর থাকতো মাঠ থেকে ফ্যাকট্রিতে বয়ে নিয়ে যাওয়া শত শত আখভর্তি ট্র্যাক্টর। এই অঞ্চলের চাল অত্যন্ত সুগন্ধি এবং সুস্বাদু। খাবার সময় মনে হত ঠিক যেন থোকা থোকা ধবধবে সাদা জুঁই ফুল থালায় চূড় করে রাখা হয়েছে। সঞ্জয়জীর বাড়ির দাওয়ায় আমগাছের নীচে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে, কাঠের বেঞ্চির ওপর রাখা কাঁসার থালায় সেই চালের ভাত আর হড়হড়ে তেলমশলায় ভেসে বেড়ানো পেঁজা তুলোর মতো নরম মাংসের ঝোল, আহা! শীতকাল হলে, বেতিয়া থেকে আঠাশ কিলোমিটার এগিয়ে, লউড়িয়ায় তিওয়ারিজীর পেট্রোলপাম্পে পিঠে রোদ নিয়ে বসে ফুলকো রুটি, আলুভাজি আর নদী অধ্যুষিত উত্তর বিহারের অববাহিকায় চাষ হওয়া, ম্-ম্ সুবাস ছড়ানো বিখ্যাত 'রহড় কা ডাল' - হাতাভর্তি গাওয়া ঘিয়ের ছোঁক্ দেওয়া। এখানে একটা

স্পষ্টীকরণ দেওয়া প্রয়োজন। বাঙালির আলুভাজা আর উত্তরের প্রদেশগুলির আলুভাজি কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস। রান্নায়, চেহারায় এবং স্বাদে পুরোপুরি আলাদা।

লউরিয়া থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে বাগ্‌হা পৌঁছতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যেত। হোটেল বা ঐধরণের থাকার জায়গা বলে তখন কিছু ছিল না। ওখানকার পেট্রোলপাম্পের মালিকের একটা গেস্টহাউস ছিল। মোট ছয়টির মধ্যে চারটে ঘর সবসময় দেখেছি তালা দেওয়া অবস্থায়। সামনে টানা বারান্দা। এক কোণে আট-বাই-আট ফুটের একটা ঘর আমাদের মতন ভি.আই.পিদের জন্য বরাদ্দ ছিল। আমরা গেলে ঘরটা খুলে দেওয়া হত। দুদিকে দুটো নারকেল দড়ির খাটিয়া, মধ্যিখানে ফাটা সানমাইকা লাগানো একটা সেণ্টার টেবিল। টেবিলের ওপর রাখা একটা হ্যারিকেন। লাইট থাকতই না, থাকলেও ভোল্টেজ এতো কম থাকতো যে তার চেয়ে হ্যারিকেন ভালো ছিল। আমরা কদিনের জন্য থাকব জেনে নিয়ে কর্মচারী গিয়ে বিছানা-বালিশের দোকান থেকে দুটো সেট্ নতুন বিছানা তুলে নিয়ে আসত। আমরা ফিরে গেলে সেগুলো আবার দোকানে ফেরত চলে যেত। স্নানের জায়গা ছিল ভেতরের উঠোনে খোলা জায়গায় টিউবওয়েলের পাশে। বালতি থাকতো না। নিজেই পাম্প করো আর পেতলের ঘটিতে জল ভরে মাথায় ঢালো। পাশের হোটেল থেকে খাবার আসত। সেই খাবার রাতে হ্যারিকেনের আলোআঁধারিতে খেয়ে নেওয়া গেলেও দিনের পরিষ্কার আলোতে খেতে গেলে অসুবিধা হতো।

পেট্রোলপাম্পের মালিক, কর্মচারীদের রাজাসাহিব থাকতেন কুড়ি কিলোমিটার মত দূরে গ্রামের পৈতৃক মহলে। কখনো বাগ্‌হা আসতেন না, এমনকি নিজের ব্যবসা দেখতেও নয়।

কেউ করতে পারল না উনি শেষবার কবে বাগ্‌হা এসেছিলেন অথবা এসেছিলেন কিনা। কাজেই ওনাকে দেখার বা ওনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ আমাদের কখনো হয়নি। একবার জেদ চাপলো যে ভদ্রলোককে দেখে ছাড়বো। কর্মচারিরা মুখে কিছু না বললেও আমাদের ওপর একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল 'রাজাসাহিবকে' কষ্ট করে বাগ্‌হা আসতে হচ্ছে বলে। বারবার বলছিল "উন্‌কো ইঁহা আনা পঢ়্‌ রহা হ্যায়", অর্থাৎ কিনা উনি এখানে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। অভিভাবক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের জেদ দেখে উনি সময় দিয়েছিলেন অমুকদিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় গেস্টহাউসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। অবশ্য উনি সেদিন না এলেও আমাদের কিচ্ছু করার ছিল না। এখানে আসল গল্প থেকে সরে গিয়ে অন্য একটা কথা বলে রাখি। আমাদের দেশে বেশিরভাগ জায়গায়, বিশেষকরে দূরদূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এই ধরণের মালিকানাধীন পেট্রোলপাম্প থেকে গ্রাহককে যদি খালি হাতে ফিরে যেতে হয়, তাহলে সেটা মালিক এবং তার পরিবারের কাছে সমাজের সামনে মুখে চুনকালি পরার সামিল হয়। যাইহোক, দিনের কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখলাম বারান্দায় দেয়ালের দিকে পিঠ করে লম্বা হাতলঅলা একটা ইজিচেয়ার রাখা আর ইজিচেয়ারের দিকে মুখ করে পুরনো দিনের হাতলঅলা দুটো কাঠের চেয়ার রাখা। আগে ঐ ধরণের ইজিচেয়ারগুলো রেলষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে দেখতে পাওয়া যেত। স্কুলের ছুটিতে বাড়ি ফেরার সময় বর্ধমান ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঐ রকম দুটো চেয়ার রাখা থাকতো। সেই দুটোতে আমি অনেকবার বসে থেকেছি। বিশ্রাম নেওয়াও হত, সখও মিটত। কিছুক্ষণের মধ্যে রাজাসাহিব গেষ্টহাউসে এলেন। ওনার আগে আগে এলো দুটো খোলা জীপে দাঁড়িয়ে

থাকা দোনলা বন্দুকধারি জনাআষ্টেক লোক। একই ভাবে আরও লোকজন এলো শেষের দুটো জীপে। মাঝখানের উইলিশ জীপ থেকে উনি নামলেন। অন্তত সাড়ে ছয় ফিট লম্বা, তিন-সাড়েতিন ফিট মতন চওড়া, ক্যালেণ্ডারের ভিলেনদের মতো গোঁফ। শালখুঁটির মতো সোজা হেঁটে এসে ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলেন। স্থির দৃষ্টি আমাদের দুজনের মাথার ওপর দিয়ে বাইরের দিকে নিবদ্ধ করে নিলেন। ঐরকম চেহারার সামনে নিজেদের কিরকম যেন বেমানান মনে হচ্ছিল। আমরা নমস্তে বলাতে মাথাটা মনে হল যেন একটু নড়ে উঠল। তবে নিশ্চিত হওয়া গেল না। মিনিট দশেকের সাক্ষাতকারে সেই মৎস-দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও দিক পরিবর্তন করেনি। বন্দুকঅলাদের মধ্যে তিনজন বন্দুকসমেত আমাদের ঠিক পেছনে প্রায় আমাদের চেয়ারের কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুএকটা কাজের কথা বলতে শুরু করে চুপ করে গেলাম, মনে হল পাথরের সঙ্গে কথা বলছি। মিনিট চার-পাঁচ পরে আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই পর্বতপ্রমাণ মানুষটি হঠাৎ করে সটান্ উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দা থেকে নেমে নিজের জীপে উঠে পড়লেন। মানুষ আর বন্দুকসমেত পাঁচটা জীপ হুশ করে বেরিয়ে চলে গেল। ধাতস্ত হয়ে বুঝতে পারলাম আমাদের মিটিং শেষ।

বাগ্‌হার উত্তর-পশ্চিমে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে গণ্ডক নদীর ওপর বাল্মিকীনগর। পুরনো নাম ভৈসা লোটন। গোটা তিরিশেক বাঘের বাসস্থান - বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভের লাগোয়া ছোট্ট এই জনবসতি। কথিত আছে বাল্মিকীমুনি জীবনের কয়েকটা বছর এখানে কাটিয়েছিলেন। এখানকার বাল্মিকী আশ্রম বেশ খ্যাতিসম্পন্ন। এছাড়া বহু প্রাচীন একটি শিবমন্দিরও এখানে আছে। গণ্ডকের ওপর একটি ব্যারেজ

আছে। বিহার সরকারের এখানকার গেষ্টহাউসটি অবর্ণনীয়রকম মনোরম এবং সুন্দর। আগে থেকে জানতে পারলে যেভাবে হোক বুকিং করে অন্তত একটা রাত্রি এখানে কাটানোর চেষ্টা করতে পারতাম। থাকা হয়নি বলে এখনও আফসোস হয়। হিমালয়ে পাদদেশে সোমেশ্বর রেঞ্জের ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এই জায়গা স্বপ্নের মতো সুন্দর, পাহাড়ের মতন শান্ত, ধীরস্থির, জলের মতন স্নিগ্ধ। তিনদিক থেকে সবুজ পাহাড়ের ছায়ায় ঢাকা গণ্ডকের কানায় কানায় ভরা সবুজ জল, হাল্কা ভেজা বাতাস, মাথার ওপর ভেসে বেড়ানো বৃষ্টিভরা মেঘ, তিনদিকে টাইগার রিজার্ভের দুর্ভেদ্য সবুজ জঙ্গল - সব মিলিয়ে নিজের কাছে নিজের হারিয়ে যাওয়ার নাছোড়বান্দা এক অনুভূতি। এককথায় বলতে গেলে বাল্মিকীনগর ছিল আমার কাছে নান্দনিক।

এটা যে সময়ের গল্প তখন বাগ্‌হা থেকে টাইগার রিজার্ভ এরিয়ার ভেতর দিয়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার গিয়ে গণ্ডকের ওপর একটা রেলব্রিজ তৈরির কাজ চলছিল। ব্রীজটা তৈরি হচ্ছিল পূর্ব উত্তরপ্রদেশের চিতৌনি আর বিহারের বাগ্‌হার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য, মুলতঃ মাল পরিবহনের সময় ও খরচ কমানোর কথা ভেবে। এই অঞ্চলে গণ্ডকের ওপর ব্রিজ তৈরির একটা মজার ইতিহাস আছে। প্রথমবার তৈরি হয়েছিল ১৯১২ সাল নাগাদ মিটারগেজ লাইন বসিয়ে। তৈরির কিছুদিনের মধ্যে নদী সরে যায়, ব্রিজ দাঁড়িয়ে থাকে ফাঁকা মাঠের ওপর। পরবর্তীকালে আরেকটি ব্রিজ তৈরি করা হয় নদীর পরিবর্তিত যাত্রাপথের ওপর। বিরক্ত হয়ে গণ্ডক আবার সরে যায়। এবার নিয়ে বোধহয় তৃতীয়বার তৈরি হচ্ছিল। কাজের ব্যাপারে কয়েকবার আমাদের কনস্ট্রাকশন্ সাইটে যেতে হয়েছে। সাইট অফিসটা ছিল উত্তরপ্রদেশ প্রান্তে। বাগ্‌হা

থেকে গাড়িতে করে আমরা পৌঁছ্তাম নদীর এপারে, মানে বিহার প্রান্তে। আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল মাঝে কোথাও যেন না দাঁড়াই এবং গাড়ীর কাঁচ যেন অবশ্যই খুলে না রাখি। ঐ রাস্তায় তিনটে ভয়ের ব্যাপার ছিল। প্রথমটা ছিন জঙ্গলী মুরগী মানুষ দেখলেই যখনতখন উড়ে এসে আক্রমণ করত। আমাদের গাড়ীর কাঁচে বারদুয়েক ঝাপটা দিয়ে গেছিল। টাইগার রিজার্ভ এরিয়া হলেও রাস্তার দুপাশের অঞ্চলগুলো ছিল ডাকাত অধ্যুষিত। ডাকাতরা অপহরণ করে নিয়ে যেত মুক্তিপণ আদায়ের জন্য। তৃতীয়টি অবশ্য আমার কাছে তখনও অবিশ্বাস্য লেগেছিল, এখনও লাগে। মেয়েদের নাকি এরকম কয়েকটি দল ছিল যারা পুরুষদের অপহরণ করে কয়েকদিন জঙ্গলে রেখে দিত শারীরিক আনন্দের জন্য। তারপর ছেড়ে দিত। যাইহোক নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছে, গাড়ি রেখে ফাইলপত্র, ব্রিফকেস হাতে নিয়ে নদীর চরের ওপর দিয়ে প্রায় দু'কিলোমিটার হেঁটে জলের ধারে পৌঁছেছিলাম। গাড়ির ড্রাইভার পইপই করে সাবধান করে দিয়েছিল যে বিকেল চারটে পর্যন্ত ও আমাদের ফেরার অপেক্ষা করবে, তারপরে একমুহূর্তও না। "ঘরমে বিবি বাচ্চা হ্যায়" - বাড়িতে বৌ, বাচ্চা আছে"। ড্রাইভারের এই একটি বাক্যই বর্ণনা করে দেয় জায়গার ভয়াবহতা, সেখানকার মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা। নদীর পাড়ে পৌঁছে দাঁড়টানা নৌকায় উঠতে হত। দুটো নৌকা সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত পারাপার করত। একদিকের জনপ্রতি ভাড়া বোধহয় দু'টাকা ছিল। মিনিটকুড়ি পরে ওপারে অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের চিতৌনির দিকে নামিয়ে দিত। সেখান থেকে আবার এক কিলোমিটারের মত বালির ওপর দিয়ে হেঁটে সাইট অফিসে পৌঁছলাম সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা করতে। অফিসে পৌঁছে সংশ্লিষ্ট

ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা হওয়াটা লটারি জেতার মতো একটা অনিশ্চিত ব্যাপার ছিল। আগের থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, কারণ যোগাযোগই করা যেত না। সাইট অফিসের একমাত্র টেলিফোনটি থাকত সাইট সুপারভাইজারের ঘরে। আর সেই ঘরে সবসময় তালা ঝুলতো কারণ তিনি প্রায় সারাদিনই সাইটে থাকতেন। সেবার সারাদিন অপেক্ষা করে সাইট অফিস থেকে বেরোতে আমাদের প্রায় পৌনে চারটে বেজে গিয়েছিল। অফিসের পিওন মহেশজী চিন্তিতভাবে বলেছিল "ইতনা দের্ কর দিয়ে আপলোগ! লাস্ট নাও তো অব্ নেহি মিলেগা" - এতো দেরি করলেন আপনারা! লাস্ট নৌকা আজ আর পাবেন না। পড়িমরি হয়ে ঘাটের দিকে দৌড়চ্ছি যাতে লাস্ট নৌকাটা মিস্ না হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছি নৌকায় লোকজন বসে গেছে, মাঝি ঘাট থেকে দড়ি খুলে নিচ্ছে। ভাবছি কিছুই আর করার নেই। অসহায় এক অবস্থা। প্রচণ্ড ভয় লাগছিল এই ভেবে যে সারারাত নদীর পাড়ে শেয়াল, কুকুরদের মধ্যে কাটাতে হবে। হঠাৎ দেখি সাইট অফিসের মহেশজী "রুক্ যাও রুক্ যাও" - দাঁড়াও দাঁড়াও বলে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল নদীর দিকে। কোনোরকমে আমাদের দিকে একবার ফিরে বললো "আপ্লোগ রুকিয়ে মত্। ম্যাঁয় কোশিশ্ কর রহা হুঁ" - আপনারা থামবেন না, আমি চেষ্টা করছি। আমরা নৌকায় উঠতে না উঠতে মহেশজী ঠকাস্ করে নমস্তে বলেই উর্দ্ধশ্বাসে উল্টোমুখে দৌড়তে শুরু করেছে। মাঝি বলেছিল পিওনকে ফিরে গিয়ে অফিস বন্ধ করতে হবে। এদিকে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। মুখে কাপড়-বাঁধা পেতলের লোটায় রাখা খাবার জল মাঝি আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিল। ফিরতি পথের দুজনের ভাড়ার চার টাকা কিছুতেই নেয়নি। বলেছিল

"আপ্‌লোগ বহুৎ থকে হুয়ে হো। অব্‌ শান্তিসে আরাম কীজিয়ে" - আপনারা খুব পরিশ্রান্ত, এখন শান্তিতে আরাম করুন। আমরা সেদিন লাস্ট নৌকা ধরে নদী পার হয়েছিলাম। সাইট অফিসের সেই মহেশজী বা লাস্ট নৌকার সেই মাঝির সঙ্গে পরে আর কোনোদিন দেখা হয়নি, আর হবেও না।

প্রতিদিনের জীবনপ্রবাহে কতোরকম মানুষের সাথে আমাদের আলাপ হয়, মেলামেশা হয়। সব মানুষ যদি একইরকম হত, তাহলে মেলামেশায় কোনো বৈচিত্রতা থাকতো না, রসকষহীন একঘেয়ে একটা জীবন সবাইকে বয়ে বেড়াতে হতো। তবুও ভেবে পাই না, লোকে কেন যে বলে পৃথিবীতে নাকি শুধুই ভালো লোক কমে যাচ্ছে!

২৯/০৬/২০২৫

****

একটি মেয়ের আখ্যান

প্রথম অঙ্ক

বহু বছরের পুরনো এক শীতের সকালে অরুণ জীবনে প্রথমবার একজন মানুষের মৃতদেহ দেখেছিল। দেহটি ছিল তার বাবার। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকে ঠিক নয় দিন পরে ছিল ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা। পারলৌকিক আচার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সেই পরীক্ষায় অরুণ বসতে পারেনি। প্রতিবারের মত সমীরের সঙ্গে ফার্স্ট হওয়ার দড়ি টানাটানি সেবার করা হয়ে ওঠেনি, পরে আর কোনোদিন সুযোগও আসেনি।

মাসদুয়েক আগে থেকে বাড়িতে বড়দের চালচলন, তাদের নিজেদের মধ্যে নীচুস্বরের আলোচনা, কথাবার্তা, যেমনতেমন করে রোজকার রান্নাবান্না শেষ করা, সবার থমথমে অভিব্যক্তি, এগুলোর সবগুলোতে জীবনের সবকিছু ভালোভাবে না চলার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তবে ইঙ্গিতের কেন্দ্রবিন্দু যে ঐ সকালেই একবারে সমূলে মুছে যাবে, এটা অরুণের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবেই, ঘটনার আকস্মিকতায় সে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। আবার, সেই বিহ্বলতা আস্তে আস্তে কাটিয়ে ওঠা শুরু হওয়ার আগেই, দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছিল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার মাত্র মাসদেড়েকের মধ্যে অরুণকে

একটি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়ে সেখানকার হোস্টেলে চলে যেতে হয়েছিল। অভিভাবকদের অভিপ্রায় ছিল ছেলেটার স্কুলের একটা বছর নষ্ট হয়ে যাওয়া আটকানো।

পর পর দু-দুটো অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা দুর্ঘটনাসমূহের সম্মিলিত চাপ অরুণের বারো বছরের মস্তিষ্কের পক্ষে সামলানো দুরূহ ছিল, সামলাতে পারেওনি। বিহ্বলতা আর বিভ্রান্তিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া অরুণ মানসিকভাবে হয়ে পড়েছিল পর্যুদস্ত এবং বিধ্বস্ত। বুঝতে পারেনি এক অদৃশ্য আস্তরণে সে ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যাচ্ছে। মাসদুয়েক আগেকার প্রাণবন্ত, ক্লাসের ফার্স্টবয় ছেলেটা নিজের অজান্তেই নিজের জন্য একেবারে আলাদা একটা পৃথিবী তৈরি করে নিয়েছিল। সেই পৃথিবীতে কারোর প্রবেশের অধিকার ছিল না, সে ছিল সেখানকার একমাত্র বাসিন্দা। অরুণের দ্বিতীয় পৃথিবী!

অরুণের ছেড়ে আসা প্রথম পৃথিবী মানুষকে গড়ে উঠতে শেখায়, দাঁড়াতে শেখায়, ভেসে থাকতে শেখায়। সেই পৃথিবীতে অরুণও ভাসতে ভাসতে গড়ে উঠছিল আর পাঁচজন সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মত, এক নিয়মিত মধ্যবিত্ত সংসারে। সেই জীবনে যা যা থাকার সবই ছিল। অল্পস্বল্প ফাঁকি মেশানো পড়াশোনা ছিল, একটু-আধটু চিটিং সমেত খেলাধুলো ছিল, ভোরবেলায় ঘুম থেকে জোর করে ওঠার অত্যাচার ছিল, ভাইবোনের ঝগড়াঝাঁটি, বন্ধুদের সঙ্গে বল নিয়ে মন কষাকষি, শীতের সকালে ঠাণ্ডা জলে অনিচ্ছার স্নান ছিল। আরও অনেককিছুর চাপ ছিল - চরিত্রশুদ্ধির বকুনি বা চড়থাপ্পড়, প্রথম পাতে উচ্ছে খাওয়ার, অঙ্কে একশ পাবার চাপ,

বৃষ্টিবিকেলে বাইরে খেলতে যেতে না পারার চাপ এইরকম সব এবং এসবের বাইরেও আরও কতকিছু ছিল!

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সৃষ্ট, একান্ত নিজস্ব সেই দ্বিতীয় পৃথিবীতে প্রবেশ করে অরুণ প্রথমে থেকে ঠিক করে নিয়েছিল যে সে নিজস্ব কোনো ব্যাপারে অন্য কারোর কাছে দায়বদ্ধ বা উত্তরদায়ী থাকবে না। কোনো এক ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে নিজের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওর ঐটুকু বয়সে ওর দুটো উপলব্ধি হয়েছিল। অরুণ বুঝতে পেরেছিল ওদের পরিবারের গাছটি ঝড়ে পড়ে গেছে এবং দ্বিতীয়ত, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া তাদের বাকি পরিবার আর কোনোদিন এক ছাদের নীচে আসবে না। একসঙ্গে বেড়ে উঠতে থাকা প্রথম পৃথিবীর বন্ধুরা অতীতে মিলিয়ে গেছে, তার পুরনো পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। এইসব অনস্বীকার্য কারণে, নিজের প্রতি নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করে নিয়েছিল যে তার সমস্তরকম কর্মের দায়বদ্ধতা এবং ফলাফল, এই দুটোই সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব হবে।

নিজের সৃষ্টি করা দ্বিতীয় পৃথিবীতে গা জোয়ারি পড়াশোনা, বন্ধুবান্ধব, খেলাধুলো, গল্পের বই এসব যে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল তা ঠিক বলা যাবে না, তবে এটা বলা যায় যে মোটামুটি একরকম গা-ছাড়া ভাবে প্রতিটি কাজ কোনোমতে ঠেকা দিয়ে দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল। এখানকার হোষ্টেলের বন্ধুরা তার ঠিক বন্ধু ছিল না - ছিল পরিচিতমাত্র। এখানকার শিক্ষকরা সবাই ছিলেন যেন অন্য গ্রহের মানুষ। এসবের অন্তরালে যা অবশ্যম্ভাবী তাই হচ্ছিল। তিন-চার বছর ধরে প্রতিটি পরীক্ষায় পাশ করে যাচ্ছিল ঠিকই, তবে ঐ বুড়িছোঁয়ার মত করে পাশ করা বলতে যা বোঝায় সেইভাবে আর কি।

শিক্ষকদের তরফ থেকে সবরকমের প্রচেষ্টার শেষে, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার মাস তিনেক আগের এক সন্ধ্যেয় হেডমাষ্টারমশায় অরুণ এবং আরও তিনচারজনকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অনেকক্ষণধরে তাদের অনেককিছু বুঝিয়েছিলেন, বলেছিলেন। তাঁর সেই সন্ধ্যের বক্তব্যের সারকথা ছিল শেষ চেষ্টা হিসেবে মাস দুয়েক স্পেশাল টিউশনের ব্যবস্থা করা হবে। তাতে বিশেষকিছু উন্নতি লক্ষ্য করা না গেলে, সেবছরের জন্য এই কয়েকজনকে হোল্ড্ আপে রাখা হবে, অর্থাৎ সেবছর পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। একবছর পরে আবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তখন একবার চেষ্টা করার কথা ভাবা হবে। যেকোনো যুগের যেকোনো ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এইধরণের কথোপকথন নিশ্চিতভাবে একটা রক্ত জল করা পরিস্থিতি। সেই ভয়াবহ সন্ধ্যের পরেও কিন্তু আমাদের অরুণ ছিল সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন, 'যা হবে দেখা যাবে' গোছের একটা মনোভাব। কারণ ও এটা জানত যে চারবছরের ঠেকিয়ে রাখা কাজ কোনোভাবেই দুমাসে শেষ করা যাবে না। যাইহোক, শেষপর্যন্ত অরুণদের সবাইকে সেবছরের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়েছিল। তারা সবাই পাশও করেছিল। আমাদের অরুণও পাশ করেছিল খুব ভালোভাবে না হলেও খুব যে একটা খারাপভাবে তাও কিন্তু নয়। অরুণের রেজাল্ট দেখে ক্লাসের সহপাঠীরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করেছিল। হাল ছেড়ে দেওয়া শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু হেডমাষ্টারমশায় আলতো মুঠিতে চুল ধরে মাথাটা সামনের দিকে একটু টেনে এনে একটু ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, পিঠে একটা হালকা চাপড় মেরেছিলেন।

রেজাল্ট হাতে পেয়ে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিল অরুণ নিজে। কিছুক্ষণের জন্য মানসিকভাবে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। তার সেই উথালপাথাল জীবনে প্রথমবার নিজের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ পেয়ে অরুণের ভালো লেগেছিল। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সেদিনের রেজাল্ট তার চেতনাবোধের পরিসরে বিস্তৃতি এনেছিল। সেই বিস্তার থেকে প্রাপ্তি হয়েছিল তিনটি অনুভব বা উপলব্ধির। বুঝতে পারল একটু চেষ্টা করলে পড়াশোনাটা আবার দাঁড়িয়ে গেলেও বা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বহুবছর আগের ছেড়ে আসা প্রথম পৃথিবীতে পড়াশোনার কিছুটা স্পর্শ এখনো মষ্তিষ্কের আনাচেকানাচে হয়তো থেকে গেছে। আর তৃতীয় উপলব্ধিটি ছিল দ্বিতীয় পৃথিবীতে শুঁয়োপোকার মতো কুড়েকুড়ে খাওয়া দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিতা। এ ছিল এমন এক একঘেয়েমিতা যা সামনে, পিছনে, ডানদিকে, বামদিকে কোনোদিকে তাকে না দিচ্ছিল এগিয়ে যেতে, না দিচ্ছিল পিছোতে, এক জায়গায় ভাসিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেইসময়ের অরুণের অবস্থান এবং অবস্থা - দুটোই ছিল জাহাজের ফ্ল্যাগের মতন, হাওয়া না থাকলে উৎসাহও নেই, উদ্দীপনাও নেই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকে একদিন একটি অফ্ পিরিয়ডে অরুণরা বন্ধুবান্ধব মিলে ক্লাসের বাইরে বসে গল্পগুজব করছিল। একটুক্ষণের মধ্যে অন্যান্য বিভাগের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীও ঐ মজলিসে যোগ দেয়। অরুণ এদের চিনত না।

আলাপ হলে নাম, ডিপার্টমেন্ট এসব জানতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ছিল রাকা। ঐ নাম বা শব্দ দুটোই ছিল অরুণের অজানা। পরে জেনেছিল রাকার অর্থ পূর্ণিমার চাঁদের আলো। অর্থ জানতে পারার পরে রাকা নামটি ভালো লেগেছিল। কে বলতে পারে আমাদের অরুণ হয়তো ভবিষ্যতে একদিন পূর্ণিমার সেই আলোতে গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসবে!

কলেজের দিনগুলো অরুণের কেটে যাচ্ছিল কলেজের দিনের মত করে। চায়ের দোকানে গল্পগুজব, সিনেমা, স্টুডেণ্ট ইউনিয়নের ইলেকশন, ছুটির দিনে সাইকেলে করে উদ্দেশ্যহীন হারিয়ে যাওয়া, হোস্টেলের বিরোধি গ্রুপের সঙ্গে নানা ব্যাপারে টেনশন্ ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের বাইরে, কখনো কদাচিৎ খুব দরকার পড়লে অথবা গল্পগুজব, আড্ডা একঘেয়ে মনে হলে সামান্য একটু পড়াশোনা। এইরকম এক চঞ্চলতায় ভরা জীবনে মাঝেমাঝে নানা আড্ডায়, নানা জায়গায় রাকার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, গল্পটল্প হত। কোনো কোনো দিন লাইব্রেরীতে গিয়ে দুজনে এক টেবিলে বসে পড়াশোনা করার অনর্থক একটা চেষ্টা করত। রাকার সঙ্গে এইরকম মাঝেসাঝে দেখা হওয়া বা সময় কাটানো অরুণের ভালোই লাগত।

দিনগুলো এরকমভাবে চলতে চলতে প্রথম পৃথিবীর কয়েকটা জিনিস অরুণের জীবনে নিঃশব্দে ফিরে আসতে শুরু করেছিল। যেমন, বাড়িতে এতোবছর ধরে প্রতি মাসে নিয়ম করে একটার বেশি চিঠি কিছুতেই লিখত না। এখন সে প্রতি সপ্তাহে চিঠি লেখে। লাইব্রেরি থেকে বই এনে গোগ্রাসে পড়ে ফেলে, বিকেলে খেলতে যায়, ক্লাসে লেকচার শুনতে শুনতে

প্রশ্ন করে, বন্ধুদের কেউ অসুস্থ হলে দেখাশোনা করে। অনেকদিন পরে অরুণ এখন বন্ধুদের আবার বন্ধু হিসেবে দেখতে শুরু করেছে, মেনে নিতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, ডিপার্টমেন্টের ভালো স্টুডেণ্টদের একজন হিসেবে অরুণের নাম স্টাফরুমের আলোচনায় আসতে শুরু করেছে। জুনিয়রদের অনেকে তার কাছে নোটস্ চাইতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় পৃথিবীর আকাশ বাতাসে বোঝা যাচ্ছিল গুটিপোকার গুটি প্রায় কেটে এসেছে। অপেক্ষা শুধু বেরিয়ে এসে ডানা শুকিয়ে, প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাবার!

বেশিরভাগ সন্ধ্যেগুলো রাকার সঙ্গে গল্প করে কেটে যেত। মাসে বারদুয়েক দুজনে একসঙ্গে সিনেমা যেত। হাতে টাকাপয়সা থাকলে মাসের প্রথম দিকে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখতে যেত। শোয়ের পরে সেখান থেকে মাঝেমধ্যে স্টেশনে চলে যেত। রেলওয়ে ক্যাটারিংয়ের মাটন্ স্ট্যু আর কাটলেটের নামডাক ছিল খুব। সেখানে বসে চিনেমাটির কাপের দুকাপ চা আর এক প্লেট করে চিকেন কাটলেট্ অথবা টোস্টের সঙ্গে মাটন্ স্ট্যু ভাগাভাগি করে খেয়ে ফিরে আসত। কারণে অকারণে একটুআধটু মন কষাকষিও হত, মিটেও যেত। হাল্কা সান্নিধ্যে ভরপুর ঐ সন্ধ্যেগুলোয় নানাধরণের গল্প হত। বাড়ির গল্প, বাড়ির লোকজনের গল্প, ছেড়ে আসা বন্ধুদের গল্প, বহুকাল আগের ক্লাস সেভেনের পরীক্ষা না দিতে পারার গল্প, এখনকার গল্প। তবে অরুণের একটা তীব্র অস্বস্তি বা অনীহা ছিল ওর একান্ত নিজস্ব দ্বিতীয় পৃথিবীর অনুভবের, অভিজ্ঞতার গল্প রাকাকে শোনাতে। অনীহা কম, অস্বস্তিটাই বেশি ছিল। রাকা সেটা বুঝতে পারত। তাই কখনো জোর করত না সেই পৃথিবীর কথা শোনার জন্য। অরুণ নিজে থেকে কদাচিৎ যতটুকু বলত সেটুকুই যথেষ্ট। নিজের ব্যাপারে রাকা ছিল

অনেক বেশি খোলামেলা। তার নিজের বাড়ি, সেখানকার লোকজন অথবা চেনাপরিচিতদের সম্বন্ধে অরুণের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে তার অসুবিধা হত না। সেইসব সন্ধ্যেগুলো ওদের দুজনের খুব নিজস্ব ছিল। ছুটিছাটায় বাড়ি গেলে দিনের এই সময়টা অরুণ খুব মিস্ করতো। মনে করা যেতে পারে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় রাকার সঙ্গে কাটানো সন্ধ্যেগুলোর ওপর অরুণ হয়তো ভরসা রাখতে শুরু করেছিলো।

তৃতীয় অঙ্ক

রাকা, অরুণদের প্রজন্মে পড়ুয়া ছেলেদের বান্ধবীদের পরিচিতি বান্ধবী হিসেবে হত না, প্রেমিকা হিসেবে হত। একইভাবে পড়ুয়া মেয়েদেরও ছেলেবন্ধু হত না, প্রেমিক হত। সেই সংজ্ঞার সূত্র ধরে কলেজে অরুণ আর রাকার পরিচিতি ছিল প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে। অন্যদের দেওয়া সেই পরিচিতি ঠিক ছিল নাকি ভুল ছিল, তা নিয়ে সেই সময়কালে চিন্তা অথবা বিতর্কের কোনোরকম সুযোগই ছিল না। যাইহোক, তখনকার সমসাময়িক পরিচিতি যাই হয়ে থাকুক না কেন, বছরপাঁচেকের সান্নিধ্যে দুজনে একে অপরের কাছে একবারের জন্যও নিজেদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যত নিয়ে মুখ খোলেনি। দুজনেই বিষয়টি হয়তো সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল অথবা যেতে চেয়েছিল। আবার এটাও হয়ে থাকতে পারে দুজনের কেউই হয়তো তাদের সমসাময়িক সম্পর্ককে ভবিষ্যতের সঙ্গে বেঁধে ফেলার কথা ভাবেনি। ওদের দুজনকে নিয়ে অন্যদের পোষ্য ধারণাগুলো ঠিক হয়ে থাকতে পারে,

আবার ভুলও হয়ে থাকতে পারে। তবে সেসব কথা এখন থাক। পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে, আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে অরুণ আর রাকার তখনকার ভাবনাচিন্তার কারণ খুঁজতে যাওয়া সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন এবং একেবারে অর্থহীন।

অবশেষে পাঁচবছর আগের মাঝদরিয়ায় ভাসতে থাকা কাণ্ডারীহীন, দিশাহীন আমাদের অরুণ, ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করে তার নিজের হাতে তৈরি দ্বিতীয় পৃথিবীর গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে উড়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সাথী হিসেবে সঙ্গে পেয়েছিল ছেড়ে আসা দু-দুটো পৃথিবীর অভিজ্ঞতা। সবার ওপরে ছিল রাকার সঙ্গে কথন কূজনে ভরা অগুন্তিসব সন্ধ্যেগুলো থেকে জমিয়ে রাখা নিঃশব্দ কায়াহীন ভরসা। সামনে ছিল তৃতীয় পৃথিবী তৈরির হাতছানি।

০২/০৫/২০২৪

****

আয়াপলি

আয়াপলির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আশির দশকের মাঝামাঝি ওদের কলকাতার বাড়িতে। আলাপটা ছিল একটা টোকেন্ অর্থাৎ প্রতীকী আলাপ। সময় জৈষ্ঠ্য অথবা আষাঢ় মাসের ঘাম-সপসপে শরীরভেজা এক দুপুর। আমাকে মরাল সাপোর্ট অর্থাৎ নৈতিক সমর্থন দিতে সঙ্গ দিয়েছিল এক ঘনিস্ট আত্মীয়। কর্মসুত্রে আমি তখন থাকতাম কলকাতার বাইরে। সুনির্দিষ্ট দিনে সকাল সকাল কলকাতা পৌঁছে সেই আত্মীয়ের অফিসে গেলাম। অফিসের নীচে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একভাঁড় এলাচ দেওয়া চা খাইয়ে সে আমায় উৎসাহ যোগানোর চেষ্টা করেছিল। চা শেষ করে পূর্ণ উৎসাহে তার স্কুটারে চেপে আমরা দুজনে বেরিয়েছিলাম আয়াপলির সন্ধানে। আয়াপলিকে সেদিন খুঁজে পেয়েছিলাম।

সেই দুপুরের মাসদুয়েক আগের অন্য এক দুপুরে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আমি বাড়ি ছিলাম। দোতলার ঘরে, সব বাড়ির মতো, আমাদের বাড়িতেও থাকতো একটা সাবেকি আলমারি। তার পরিচয় ছিল 'মায়ের আলমারি' নামে। একদিন সকালের দিকে সেই ষ্টীলের আলমারি থেকে প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র বার করার সময় সেগুলো আমার হাত থেকে পড়ে যায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া সেইসব কাগজ কুড়োতে গিয়ে সেগুলোর মধ্যে আমি আয়াপলিকে প্রথম দেখি। ছবিতে আয়াপলিকে দেখে আমার ভালো লেগেছিল। অবশ্য ঐরকম

বয়সের একজন ছেলের সমবয়সি একজন মেয়ের ছবি দেখে ভালো লাগার মধ্যে আশ্চর্য হবার কোনো অবকাশ থাকে না, বরং সেটাই স্বাভাবিক। তবে মায়ের আলমারিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মেয়ের ছবি কেন থাকবে সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, আমারও হয়নি।

বংশপরম্পরায় আয়াপলি পূব দেশের মেয়ে। কিন্তু সে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ দেশে, আর পাঁচজন দক্ষিণী ছেলেমেয়ের সঙ্গে, তাদের পরিবেশে তাদের মতো করে। স্বাভাবিকভাবেই দৈনন্দিন জীবনে তার রুচি, অভিরুচি, পছন্দ, অপছন্দ, পোষাকপরিচ্ছদ, চালচলন, খাওয়াদাওয়া, ভাষা সবকিছু ছিল দক্ষিণ ঘেঁষা।

যাইহোক, এতরকমের অমিল থাকা সত্ত্বেও, আমাদের প্রতীকী পরিচয়ের মাসছয়েকের মধ্যে, আগে পরে না ভেবে এক মাঘের রাতে আমরা দুজনে একসাথে নদীর জলে নৌকা ভাসিয়েছিলাম। নতুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর অধীরতায় সেই রাতে জল মাপা হয়নি।

শীতের নদীতে জল এমনিতেই কম থাকে। আমাদের ছোট নৌকা কখনো নীচের কাদায় আটকায়, তো কখনো কচুরিপানায় জড়িয়ে যায়, আবার কখনো স্রোতে ভাসমান ভাঙ্গা ডালপালায় ঠোকা খায়। যখন এসবের কোনটাই থাকেনা, তখন সামান্য হাওয়াতেও সে দুলে ওঠে। আর ঝড় উঠলে তো কথাই নেই। আমার চিন্তা হতো। নৌকা ভাসিয়ে রাখার চিন্তা, নৌকা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা, আয়াপলি কি ভাবছে না ভাবছে তার চিন্তা, নিজেকে নিয়ে চিন্তা, নিজেদের নিয়ে চিন্তা। আমার এতসব ঠিক-বেঠিক চিন্তাগুলো আয়াপলি আন্দাজ করতে অথবা বুঝতে পারত কিনা জানিনা, তবে ওর

মুখেচোখে সবসময় ‘সবই তো ঠিক আছে’ গোছের একটা নিষ্পৃহ ছাপ নিশ্চিতভাবে থাকত।

এসব স্মৃতি বহু পুরনো দিনের। ইতিমধ্যে নদীতে জল বেড়েছে, নদী বড় হয়েছে। আমাদের নৌকাতে লোক বেড়েছে। কচিকাঁচা, বয়স্ক সবাইকে নিয়ে ভেসে চলতে চলতে অল্প জল থেকে আমরা গভীর জলে চলে এসেছি। আশপাশ দিয়ে কয়েকটি নৌকা চেনা-অচেনাদের নিয়ে তদের গন্তব্যে ভেসে চলেছে। ঢেউযের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব নৌকায় বসে থাকা মানুষদের দুলুনি অনেকটা কমে গেলেও একেবারে থেমে যায়নি। নদীর গায়ে জড়িয়ে থাকা নরম, কোমল বাতাস মাঝেসাঝে হঠাৎ করে ছলাৎ-ঢেউ দিয়ে নৌকাগুলাতে ধাক্কা দিয়ে যায়। আমাদের শান্ত নৌকা কেঁপে ওঠে, আমরা সবাই কেঁপে উঠি। আবার একটু পরেই নিজে থেকে সবকিছু শান্ত হয়ে যায়। দমকা বাতাস বইলে আয়াপলি সবদিক সামলে নেয়, সবাইকে সামলে নেয়, শান্ত করে, নিশ্চিন্ত করে, একে অন্যের হাত শক্ত করে ধরে থাকতে বলে। এককথায় বলতে গেলে, আমরা সবাই পরম এক নির্ভরতায় আমাদের ভালোমন্দ সবকিছুর জন্য ওর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। ও কখনো আমাদের নিরাশ করে না। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবস্থাপনায় এবং পরিচালনায় আমাকে কখনও বিরক্ত করে না। শুধু রসদের জন্য কিছুদিন অন্তর আমাদের নৌকা গঞ্জের ঘাটে বাঁধতে হয়। সেই সময়গুলোতে আমরা সবাইমিলে নদীর ঘাটে নামি, রসদ কেনাকাটা করি, মাটি স্পর্শ করি।

এতদিন ধরে ভেসে চলতে চলতে কবে যে আয়াপলি আমাদের নৌকার ছাউনি হয়ে নিজেকে সবার ওপর মেলে ধরেছিল সেটা আমি খেয়াল করিনি, বুঝতেও পারিনি। অনেক পরে যখন

বুঝতে পেরেছি তখন থেকে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে থাকি। আমার একমাত্র দায়িত্ব আমাদের নৌকা ভাসিয়ে রাখা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আয়াপলির ছত্রছায়ায় থাকা আমার সেই সীমাবদ্ধতায় দৃষ্টিকটুত্ব বলে কিছু ছিল না।

নানারকম চিন্তাভাবনা, একটানা ভেসে থাকার কাজ, নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে যাবার কাজ, সবকিছু সামলাতে গিয়ে বাইরের চারপাশ নজর মেলে দেখার সময় হয়ে ওঠেনি। একদিন আবিষ্কার করলাম মাঝের বছরগুলো নদীর স্রোতে কবে যে হারিয়ে গেছে, আমরা বুঝতেও পারিনি। অবাক হয়ে দেখলাম সময়ের সাথেসাথে নদীর দুপাশের পাড়দুটো বদলে গেছে। ঘরবাড়ি, মানুষজন, গাছগাছালি সবকিছু অন্যরকম দেখতে হয়ে গেছে। চেনা, পুরনো পাখীদের আর দেখা যায় না, নতুন নতুন নানারকম পাখী আকাশ দখল করে নিয়েছে। প্রকৃতির চেহারায় অন্য এক সবুজের ছায়া এসেছে। অন্যদিকে, আমাদের নৌকার বয়স্করা সবাই এক এক করে নিয়তির নির্ধারিত সময়ে নিজস্ব গন্তব্যের ঘাটে নেমে গেছে। সেদিনের কচিকাঁচাদের আজ বয়ঃপ্রাপ্তি হয়েছে। তারা সবাই নিজেদের নৌকা নিজেরা তৈরি করে যে যার মতো করে রওনা দিয়েছে। কালের নিয়মে চলা এই বহমান পরিবর্তনে আমরা দুজন - আমি আর আয়াপলি - একইরকম থেকে গেছি। আবার এটাও হতে পারে যে আমাদেরও হয়তো পরিবর্তন হয়েছে আমাদের অজান্তেই, নদীর ঠিক ঐ দুই পাড়ের মত। এতসব পরিবর্তনের মধ্যে চিরন্তন থেকে গেছে শুধুমাত্র আমাদের নৌকা।

যুগ যুগ ধরে ভেসে চলতে চলতে খেয়াল করিনি আমাদের নৌকা আমাদের নিয়ে কখন সাগরের মোহনায় এসে

পৌঁছেছে। দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি এখানে বিহঙ্গ-চপলতায় ঢেউ খেলে বেড়ায়। এই স্বর্গীয় পরিবেশে, সাগর ছোঁয়ার আশায় নৌকায় আছি শুধু আমি, আর আছে আয়াপলি, তার 'সবই তো ঠিক আছে' ভাব নিয়ে; কবেকার পুরনো সেই মাঘী রাতের মতো, একই রকম।

০৪/০৯/২০২৪

******

ভ্যানিটি ব্যাগ

বাড়ির বাইরে যেতে হলে বা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় চিরকালই মানুষসঙ্গে কিছু টাকাপয়সা রাখে। এখনো রাখে। দাদামশায়, ঠাকুর্দাদের আমল পর্যন্ত সবাইকে দেখেছি টাকাপয়সা জামা অথবা কোটের পকেটে নাহলে ধুতির কোমরে গুঁজে রাখতে। সেরকম কয়েকজনকে দেখেছি যাঁরা এসব নিজেদের কাছে রাখতেনই না। সঙ্গের আত্মীয় বা লোকেদের কাছে থাকতো। দরকারে তারা টাকাপয়সা যাকে দেবার দিয়ে দিত। দিদিমা, ঠাকুমারা কস্মিন কদাচিৎ যখন বাইরে বের হতেন, পয়সা রাখতেন শাড়ীর আঁচলে বেঁধে। তাঁদের কাছে পান-দোক্তার নক্সা করা কৌটোটি ছিল টাকা-পয়সার চেয়ে অনেক বেশি কাজের এবং মূল্যবান। সেই কৌটো নিজের পাঁচ আঙুল দিয়ে ধরে রাখতেন।

তারপর এলো আমাদের বাবা-মায়েদের সময়কাল। ঐ সময়ে মহিলারা বাড়ী থেকে বেরোনোর সময় কব্জি থেকে কনুইয়ের মধ্যিখানে ঝুলিয়ে নিতেন নিজেদের পছন্দের একটি সুদৃশ্য ব্যাগ। পোশাকি নাম ছিল 'ভ্যানিটি ব্যাগ'। আর পুরুষেরা পকেটে যেটা রাখতেন তার নাম ছিল 'মানিব্যাগ'। অনেকদিন হয়ে গেল, মানে মোটামুটি আমাদের প্রজন্মের রোজগার শুরু করার সময় থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ আর মানিব্যাগ তাদের নামের পরিবর্তনের কাজ শুরু করে। নতুন পরিচিতি হয় মহিলাদের জন্য 'হ্যাণ্ডব্যাগ' আর পুরুষদের জন্য 'পার্স্'।

আজকের কাহিনী বহু পুরনো সেইরকম এক ভ্যানিটি ব্যাগের কাহিনী। চামড়ার তৈরী ছোটখাটো চেহারার ব্যাগটি বহু বছর ধরে আছে আমাদের আলমারিতে এক জায়গায়, একইভাবে। গাঢ় বাদামি রঙের সেই ব্যাগ অনেকদিন হলো বয়েসের ভারে এখন তুলতুলে নরম, আর বহুবছরের প্রয়োজনহীনতায় দৃশ্যতই মনমরা। চেহারায় ভীষণরকম ক্লান্ত। আলমারি খুললে একেবারে চোখের সামনেই ব্যাগটা রাখা থাকে। দৃষ্টির মধ্যে থাকলেও বেশিরভাগ সময় কারও নজরে পড়ে না, অনেকটা ঐ বাঁধানো ফ্রেমে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা পূর্বপুরুষদের ছবির মত।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও কোনো এক প্রয়োজনে আলমারিটা খুলেছিলাম। প্রথমেই সেই ভ্যানিটিব্যাগ নজরে পড়ল - নিজেরই অজান্তে এবং সম্পূর্ণ অকারণে। আলমারি থেকে বার করে খাটের ওপর রেখে মুখটা খুললাম। দেখতে পেলাম ব্যাগের ভেতরে অনেককিছু আছে। সেগুলোর চেহারা ছিল ঠিক যেন পরিত্যক্ত বাড়ির পলেস্তারা খসে যাওয়া দেওয়ালে ঝুলে থাকা ঘোলাটে হয়ে যাওয়া ছবির মতন। বোঝাই যাচ্ছিল জিনিসগুলি সেখানকার আবাহমানকালের বাসিন্দা, ইংরিজীতে যাকে বলে পার্মাণেণ্ট্ রেসিডেণ্ট। দু-চারটি জিনিস চিনতে পারলাম। সেগুলো আমার পূর্বপরিচিত। বাকিগুলো পুরোপুরি অপরিচিত। দু-তিনটে জং ধরে যাওয়া সেফ্টিপিন, কয়েকটা পরিষ্কার ঝকঝকে সেফ্টিপিন্, চেক চেক ডিজাইনের ছোট্ট একটা মেয়েদের রুমাল, চুলের একটা কাঁটা, কারোর সোয়েটার থেকে খুলে যাওয়া ছাই-ছাই রঙের একটা আধুলি সাইজের বোতাম, দোমড়ানো মোচরানো ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া পুরনো দিনের একটা দু'টাকার নোট, রূপোর তৈরী ইঞ্চি দেড়েক লম্বা দুই পায়ের দুটি পুজোর খড়ম্। আর আছে

রাবারব্যাণ্ড দিয়ে আটকানো চশমার একটা ভাঙা প্লাস্টিকের খাপ। সময়ের ভারে রাবারব্যাণ্ড গলে গিয়ে খাপের সঙ্গে চিটিয়ে গেছে।

চিটিয়ে যাওয়া রাবারব্যাণ্ড ফেলে দিয়ে চশমার খাপটি খুলে ভেতরের জিনিসপত্র বিছানার ওপর নামিয়ে দিতে জিনিসপত্র পরিষ্কার দেখা গেল। জায়গা জুড়ে একটু বেঁকে যাওয়া সোনালী ফ্রেমের একটা চশমা। চশমা সরিয়ে খাপের বাইরে আনলাম 'ধান বিক্রি শুরু হতে দেরি হবে' খবর দিয়ে কারোর লেখা একটা ছোট্ট চিরকুট, মুরমুরে হয়ে যাওয়া একটা পাঁচ টাকার নোট, আমার দাদামশায়ের শখের শ্যেফার্স কলম আর আমার বাবার পকেট চিরুণি। শ্যেফার্সটিতে কারোর হাত দেওয়ার পারমিশন ছিল না। আর ছিল বছর পাঁচ-ছয়েকের নাতির তার ঠাকুমাকে রুলটানা ছেঁড়া পাতায় রঙপেন্সিল দিয়ে কাঁচা হাতের ইংরিজীতে লেখা দু'বাক্যের একটা চিঠি - 'হাউ আর ইউ? আই লাভ ইউ', পাশে একটি পাঁচ পাপড়িঅলা ফুল আঁকা।

এতদুর পর্য্যন্ত ঠিকঠাক ছিল - একটু ভাবুকতা, বেশ খানিকটা মন খারাপ আর প্রচুর স্মৃতির ঝোড়ো হাওয়া সত্ত্বেও। তারপর হঠাৎ করে ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতরের এক কোণায় পড়ে থাকা ছোট্ট যে জিনিষটা বেরিয়ে এল সেটা যেকোনো মানুষের চেতনাবোধকে সম্পূর্ণভাবে হতভম্ভ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। জিনিসটা আর কিছুই নয়, পুরনো একটা রেলের টিকিট। সেইসময় ট্রেনের টিকিট হতো কার্ডবোর্ডের তৈরি, ছোট, আয়তাকার, একদিকটা প্রিণ্টেড, অন্যদিকে রিজার্ভেশন ক্লার্ক হাতে লিখে দিতেন ট্রেনের নম্বর, যাত্রার তারিখ, যাত্রীর নাম বয়স, কোচ নম্বর আর বার্থ নম্বর। ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতরের

এক কোণায় সবকিছুর আড়ালে পড়ে থাকা সেই টিকিটের পেছনে ডট্‌পেনের নীল রঙের কালিতে লেখা ছিল "০৩/০৩/০১, ফিমেল ৬০, এস২১, বার্থ নং ১৩। একটু চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেল এটা ছিল ভ্যানিটি ব্যাগের তার বাপের বাড়ী থেকে শেষবারের মতো চলে আসার ট্রেণের টিকিট।

২৮/০৭/২০১৯

*****

সাতশ পাহাড়ের দেশে (১)

আশির দশকের প্রথমদিকে চাকরিতে জয়েন করার পর আমার প্রথম পোষ্টিং হয় একটি সুন্দর শহরে, যার নাম জামশেদপুর। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, অরণ্য এসবকিছুর অনুপস্থিতিতে কোনো শহর যে শুধু কয়েকটা বড় বড় কারখানা দিয়ে এত সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়, সেটা জামসেতজি এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্মেরা জামশেদপুরের পত্তনি থেকেকেই করে দেখিয়ে দিয়েছেন। সবমিলিয়ে বছর ছয়েক ছিলাম। আমার একান্ত পছন্দের জায়গা হিসেবে জামশেদপুর সম্বন্ধে আমি অনর্গল কথা বলে যেতে পারি। কিন্তু আজকের লেখা শহরটা নিয়ে নয়, তাকে ছেড়ে সেখান থেকে শ'দেড়েক কিলোমিটার দূরের কোন এক জায়গা নিয়ে।

জামশেদপুর শহর থেকে বেরনোর তিনটে রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তা টাটানগর ষ্টেশনের পাশ দিয়ে ষাট কিলোমিটার দূরে চাইবাসা চলে গেছে। চাইবাসা সিংভুম জেলার জেলাসদর, অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার। আমাদের এই রাস্তা চাইবাসা শহরটাকে আধাআধি ভাগ করে তার মাঝখান দিয়ে গিয়ে, ঝিঁকপানির এ.সি.সি. সিমেন্ট কারখানার গা ঘেঁষে, জগন্নাথপুর, হাতগামারিয়া, নোয়ামুণ্ডির ভেতর দিয়ে আরও প্রায় নব্বই কিলোমিটার দূরে বড়াজামদা পৌঁছে গেছে। বড়াজামদাকে ঐ অঞ্চলের লোকেরা আদর করে 'জামদা' বলে ডাকে। যাবার পথে রাস্তাটি টাটানগর - বড়াজামদা রুটের রেললাইনের

লেভেলক্রসিংয়ের সঙ্গে মোট সাতবার কাটাকুটি খেলতে খেলতে যায়। এই কাটাকুটি খেলাটা ছিল ট্রেনের ড্রাইভার আর আমাদের মধ্যে একটা মজার খেলা। প্রথম লেভেলক্রশিং যদি ট্রেনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বন্ধ পাওয়া যায় তাহলে তার পরে এগিয়ে যাওয়ার পথে পরপর বাকী ছটাতেও দাঁড়িয়ে পড়তে হবে ঐ একই ট্রেনকে পাস করানোর জন্য। আবার উল্টোটাও হতো। প্রথমটা খোলা পেয়ে গেলে বাকি ছয়টাও খোলা পাওয়া যেত। মাঝেমধ্যে উভয় ড্রাইভারের মধ্যে মুচকি হাসির বিনিময় অথবা হাত নাড়ানাড়িও হতো। আমাদের আজকের কাহিনী সাতটি লেভেলক্রসিং পার হয়ে আসার পর সেই জামদা থেকেই শুরু। অষ্টম ক্রসিংটি জামদার ঠিক বাইরে, বারবিল যাবার রাস্তায়। কিন্তু এবার আমরা সেদিকে যাব না।

শাল গাছের ঘনজঙ্গল, লৌহ আকরিক অর্থাৎ আয়রন ওরের লাল ধুলো, ভীষণভাবে হাতি অধ্যুষিত আর বিভিন্ন প্রজাতির চরম থেকে চরমতম হতদরিদ্র আদিবাসীদের নিয়ে লাল মাটির দেশ, সারাণ্ডা ফরেস্ট। সারাণ্ডা - সাতশ পাহাড়ের দেশ। এই নামের উৎস জানিনা; হতে পারে পাহাড়ের সংখ্যা মোটামুটি সাতশ বলে। আবার হো প্রজাতির আদিবাসীদের ভাষায় হাতিকে বলে সারাণ্ডা। আদিবাসীদের মধ্যে এখানে সাঁওতাল, হো আর মুণ্ডা প্রজাতির প্রাধান্য বেশি। বাকি প্রজাতিদের নাম আমার জানা নেই। তবে সেইসময় শুনতাম সারাণ্ডার একেবারে গহীন গভীরে নাকি আরও কয়েকটি আদিমতর প্রজাতির মানুষের বাস, যারা বাইরের দিকে আসে না। আমাকে যেদিকটায় ঘোরাফেরা করতে হত সেদিকের প্রায় পুরোটাই মুণ্ডা প্রজাতি অধ্যুসিত অঞ্চল ছিল।

একে অন্যটার গায়ে লেপ্টে থাকা পাহাড়গুলো বারশ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে। দুশো-আড়াইশ ফিট করে হাইট এবং বয়স্ক থেকে অতিবয়স্ক ঘন শালজঙ্গলের কারণে সারাবছরই সূর্যকে এখানে শালগাছের ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে মাটি স্পর্শ করতে হয়। প্রাকৃতিক বিচারে সারাণ্ডা হচ্ছে শাল, পাহাড় আর হাতির এক সীমাহীন সমষ্টি। বইপত্র ঘাঁটলে জানা যায় এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম শাল জঙ্গল এই সারাণ্ডা ফরেস্ট যার সিংহভাগ তখনকার বিহার, এখনকার ঝাড়খণ্ডের সিংভূম, রাঁচি আর সিমডেগা জেলা জুড়ে। বাকি অল্প অংশটা প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িশায়। হাতিদের আয়ুষ্কাল পঞ্চাশ ষাট বছর, পাহাড় চিরঞ্জিবী আর উত্তরাখণ্ডের লোককথায় - '***শাল, সৌ সাল খাড়া, সৌ সাল পড়া, সৌ সাল সড়া***' - *শাল গাছ বড় হয় একশ বছর ধরে, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে একশ বছর ধরে, তারপর পড়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে নেয় আরও একশ বছর।*

কাজের প্রয়োজনে বিহারের সারাণ্ডার আনাচে কানাচে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হত। সেখানেই হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং কিছুটা প্রেম। সেই বিস্তৃত অঞ্চলের ব্যস্ততা, অর্থনীতি এবং জীবনযাপন সবকিছুই আয়রন ওর্ মাইনিং ঘিরে। স্টীল অথরিটি, ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল, টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল এরা প্রত্যেকে এই অঞ্চলে মাইনিং করে নিজেদের স্টীল প্ল্যাণ্টগুলোর চাহিদা মেটায়।

জামদা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশ মোটামুটি ধু ধু রুক্ষ প্রান্তর, ছড়ানো ছেটানো অল্পস্বল্প গাছপালা, যার মধ্যে বেশিটাই বুনো ঝোপ। বহুদূরে কম উঁচু বেশি উঁচু ঢেউখেলানো সব পাহাড়। এখানে পৌঁছে আমাদের রাস্তা দুভাগ হয়ে যায়। বাঁদিকেরটা

ঢুকে পড়ে ওড়িশার বারবিলের পথে। তারপর সেখান থেকে কেওনঝাড়, জাজপুর, পানিকৈলি হয়ে কটক, ভুবনেশ্বরের দিকে চলে যায়। অন্য রাস্তাটি সোজাসুজি একটুখানি এগিয়ে গিয়ে সারাণ্ডার ভেতরদিকের সব মাইনিং এরিয়াগুলোর দিকে চলে যায়। আজকের গল্পে আমরা নেব লাল কাঁকড় আর মিহি লাল ধুলোয় ভরা এই রাস্তাটি। সামান্য এগিয়ে যাওয়ার পরে রাস্তাটি আবার দুভাগ হয়ে যায়। বাঁদিকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার ঘাট রাস্তা উঠে যায় সাড়ে তিনহাজার ফিট মতো উঁচুতে কিরিবুরু, সারাণ্ডার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে। 'কিরি' মানে হাতি, 'বুরু' অর্থাৎ পাহাড় - 'হিলস্ অফ এলিফ্যাণ্টস'। ওখান থেকে একই রাস্তা নেমে আসে একটু নীচের দিকে মেঘাহাতাবুরু, 'হিলস্ অফ ক্লাউডস্'। দুজায়গাতেই ষ্টীল অথরিটির অফ ইন্ডিয়ার মাইন্স। আজ আমরা এদিকটায় যাচ্ছি না। অন্য একদিন যাওয়া যাবে।

আজকে আমরা ধরবো ডানদিকের রাস্তা। প্রথমে আসবে গুয়া। গুয়া থেকে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আরও দুর্গম, আরও গভীর এহং ভয়ানকভাবে হাতি অধ্যুসিত জঙ্গলের আরও চল্লিশ কিলোমিটার মতো ভেতরে চিড়িয়া। চিড়িয়া আমি অনেক পরে গিয়েছি। তার গল্প পরে একদিন কিরিবুরুর সঙ্গে শোনানোর ইচ্ছে রাখছি। গুয়া এবং চিড়িয়াতে ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানি মাইনস্ আছে।

বাইরের লোকের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে হলে সারাণ্ডার শালজঙ্গলে জড়ানো পাহাড় কাউকে মানসিক প্রস্তুতির সময় দেয় না। রাজকীয় ভঙ্গিতে, স্বমহিমায় আচমকা সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রথমবার আমাকেও সে সময় দেয়নি। যতটা মনে আছে দুপাশ থেকে ঘন গাছগাছড়ায় চেপে ধরা সরু রাস্তা দিয়ে পনেরো কিলোমিটার মতো দূরত্বে গুয়া। সময়টা ছিল

ভরদুপুরবেলা। লাল কাঁকড়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলা গাড়ির চাকার মড়মড় আওয়াজ, ঘন লাল রঙের পাউডার-মিহি ধুলো, আকাশঢাকা উঁচু উঁচু শালের ঘন জঙ্গল, মাটিতে লুটিয়ে পড়া আলোছায়া রোদ, খেলায় মত্ত কয়েকটা শেয়ালের বাচ্চা, অসংখ্য কাঠবিড়ালি, চাপা নীরবতার প্রলেপে জড়ানো চারপাশ আর একা আমি। আগের দিন অফিসের গুহদা সাবধান করে দিয়েছিলেন "প্রথমবার একা একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছ, চারদিক ভালো করে নজরে রেখে ড্রাইভ করবে। গুয়ার রাস্তায় কিন্তু প্রায়ই হাতি চলে আসে"। সবমিলিয়ে একটা গা ছমছমে ব্যাপার তো বটেই। অর্দ্ধেকের বেশি পথ পেরোনোর পর কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলাম যখন কয়েকজন আদিবাসী মেয়েকে দেখতে পেলাম শুকনো শালপাতা, ভাঙ্গা ডালপালা এসব কুড়োতে। কয়েকটি আঠেরো কুড়ি বছর বয়সি ছেলেকেও দেখলাম কাঁধে তিরধনুক নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে। পরে জানতে পেরেছিলাম ছেলেরা সব পাখি, কাঠবিড়ালি, শেয়াল বা হরিণের দলছুট বাচ্চা, এসব খুঁজে বেড়ায় শিকারের জন্য।

গুয়া পৌঁছে রামালিঙ্গমের সঙ্গে চা-পকোড়ার সাথে গল্পগুজব মেশানো কাজকম্মো সারতে সারতে চারটে বেজে গিয়েছিল। রামা ছিল পারচেজ ম্যানেজার, আমাদের সমবয়সী এবং বন্ধু। আমাদের কেউ গেলে ও খুশি হতো, বাইরের লোকের সাথে আড্ডা দেওয়া যাবে বলে। বিকেল চারটে ছিল ওদের অফিস ছুটির সময়। আমার থাকার ব্যবস্থা ওখানকার গেস্টহাউসে। বহু পুরনো কিন্তু ভীষন ভালো তার রক্ষণাবেক্ষণ। বিল্ডিংটি ছিল দোতলা। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সারি সারি চোদ্দটা রুম ওপরে। রুম বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না, ওগুলো আসলে স্যুইট। নীচে আটটা স্যুইট। নীচের বাকি ছয়টার জায়গা নিয়ে

এক বিশাল ডাইনিং হল্ কাম্ ফটো গ্যালারি। চার দেওয়ালে পুরনো থেকে বহু পুরনো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা নষ্টালজিক ছবির ফ্রেম। দুটো তলাতেই রুমগুলোর সামনের দিকটায় টানা বারান্দা। নীচের বারান্দার সামনের পুরোটা মোটা লোহার গ্রিল দেওয়া, কৌতূহলী হাতিদের আটকানোর জন্য। আমার রুম দোতলায়। সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা ডিনার টাইম। যাইহোক্, স্নান করে ফ্রেস হতে চেয়েছিলাম। তবে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি, কারণ আয়রন ওর অর্থাৎ লৌহ আকরিকের দেশে জলের রঙও ছিল লাল।

ঠিক সাড়ে সাতটায় ডিনারে গেলাম। বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। শুকনো পাতার গালিচা আর এদিক ওদিক দাঁড় করিয়ে রাখা ডাম্পার ট্রাকগুলোর ওপর জল পড়ার ভালোরকম আবোলতাবোল আওয়াজ। ডাইনিং হলে বিরাট লম্বা খান তিরিশ বত্রিশ চেয়ারঅলা ডাইনিং টেবিল। খাবার সার্ভ করা হয় পুরোপুরি সাহেবি কায়দায়, যে কায়দার সঙ্গে সেই বয়সে এবং তারপরের বহুবছর পযর্ন্ত আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। বেয়ারা সার্ভ করে আমার বাঁ কাঁধের ঠিক একহাত পেছনে সিপাহিদের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ বুঝতে পারছিলাম না, তাই স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি হচ্ছিল। 'কিছু লাগলে ডেকে নেব' বলে ওকে ওখান থেকে সরানোর জন্য বারদুয়েক চেষ্টা করেছিলাম, ও নড়েনি। বলেছিল 'তোমার খাওয়ার তদারকি করা আমার ফর্জ, কর্তব্য'। অনেক পরে জেনেছিলাম বেয়ারার ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা ছিল ফর্মাল ডিনার প্রোটোকলের একটা অঙ্গ।

ব্রেকফাস্ট টাইম সকালে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা। আটটার সময় অফিস শুরু, বারোটায় লাঞ্চব্রেক দুঘণ্টার,

তারপর আবার দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত অফিস। কাজ শেষ করে রামার সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে একসঙ্গে লাঞ্চ করেছিলাম। পেঁয়াজ-করলা ভাজা, ডাল, জঙ্গলি মুরগির ঝোল আর রুটি। শেষপাতে প্রাগঐতিহাসিক চেহারার এবং স্বাদের দুটো করে পান্তুয়া। বের হতে হতে দুটো বেজে গিয়েছিল। ভোররাতের দিকে বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ তখনো মেঘলা। বৃষ্টিভেজা হাল্কা হাওয়া গায়ে মেখে ড্রাইভ করতে ভালোই লাগছিল। আগের দিন যেহেতু এই রাস্তা দিয়ে একবার গিয়েছিলাম তাই এবারের টেনশন একটু কম। চারপাশ একইরকম চুপচাপ, শুনশান্। এইরকম নিস্তব্ধতার নিজস্ব একটা আওয়াজ আছে। আমরা সেই আওয়াজ শুনতে পাইনা, আমাদের শরীর শুনতে পায়। সেইরকম নিস্তব্ধ পরিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের মন পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে এক চরম শান্তিতে ভরে ওঠে। নিস্তব্ধ সেই পরিবেশের সন্মানে পাখিরাও চুপ করে থাকে। শান্তিতে আবিষ্ট আমি গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। মাঝামাঝি পৌঁছে একটু দূর থেকে নজরে পড়ল একটা লোক অদ্‌ভুতভাবে হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কোনোরকম নড়াচড়া করছে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি আর আমার গাড়ি স্থানুবৎ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে মনে হলো কোনো ডাম্পার ট্রাক হয়তো লোকটাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। একবার ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে রামাকে ঘটনাটা জানাই। শেষপর্যন্ত অবশ্য যাইনি। তবে এতো যুগ পরে আজ আমি নিশ্চিত যে সেদিন ফিরে গেলে খুব ভুল করতাম। অকল্পনীয়রকম দারিদ্রতার সঙ্গে গভীর প্রত্যন্ত জঙ্গলে বসবাসকারি আদিবাসীদের জীবনযাত্রার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ, 'সামাজিক স্বাধীনতাবোধ' চাক্ষুস দেখার

সুযোগ বা অভিজ্ঞতা হয়তো আর কখনো পেতাম না। পরে আর কোনও দিন পাইওনি।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পড়ে থাকা নিশ্চল লোকটার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে দেখলাম আরও কিছুটা সামনে একইরকম ভাবে আরও লোক পড়ে আছে রাস্তায়। তবে এবার একজন নয়, মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে বেশ কয়েকজন এবং রাস্তার ওপর বেশ খানিকটা জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এবার পাশ কাটিয়ে যাবার জায়গা ছিল না। আমি ভেবে নিয়েছিলাম ভয়ঙ্কর ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতির কুলকিনারা না পেয়ে বেশ ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম। অবশেষে মরিয়া হয়ে রাস্তা থেকে শালপাতার কার্পেট বিছানো জমিতে গাড়ি নামিয়ে এনে, রাস্তাটাকে পাশে রেখে, এ গাছ সে গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে যতটা সম্ভব গতি বাড়িয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম এবং সেভাবে বেরিয়ে যেতেও পেরেছিলাম। তখনই দেখেছিলাম হাঁড়িয়ায় চূড় হয়ে বিভিন্ন বয়সের বেশ কিছু মেয়ে, পুরুষ গাছের গুঁড়িতে এলিয়ে অথবা মাটিতে চোখ বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে, ঠিক রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষগুলোর ভঙ্গিতে। তারা জীবিত না মৃত দেখে বোঝার উপায় ছিল না। আর যারা হুঁশ তখনও হারায়নি তাদের মধ্যে অনেকে ওখানেই উদ্দাম রতিক্রিয়ায় মগ্ন। বাকিরা পাশে বসে হাঁড়িয়া খেতে ব্যস্ত।

কেন জানিনা, সেই বিকেলের বড়জোর মিনিট কয়েকের আচম্বিত ঐ ঘটনাপ্রবাহ মানসিক দিক দিয়ে আমাকে এতটাই পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল যে এর পরের ঘণ্টাচারেকের স্মৃতি আমার কাছে আজও খুব ঝাপসা। শুধু এটুকু মনে আছে মাঝে কোথাও গাড়ি না দাঁড় করিয়ে একেবারে থেমেছিলাম জামশেদপুরে বাড়ির দরজায় পৌঁছে।

এই অভিজ্ঞতার কথা বহুদিন কাউকে বলিনি। বেশ কয়েকবছর পরে রাঁচীতে থাকাকালীন এক আদিবাসী বন্ধুকে ঘটনাটা বলেছিলাম। আমাকে একটু অবাক করে উনি এটাকে খুব সাধারণভাবে নিয়েছিলেন এবং তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। বন্ধুটি বলেছিলেন 'আগের রাতের বৃষ্টি যেকোনো কারণেই হোক জঙ্গলবাসী ঐ লোকজনদের খুব আনন্দ দিয়েছিল। সেই আনন্দ পরের দিন দুপুরে ওরা উদযাপন করছিল। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লোকগুলোর কেউই গাড়ির চাকার নীচে পিষে যায়নি। সারাদিন ধরে আকণ্ঠ হাঁড়িয়া খেয়ে ওরা বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় পড়েছিল। হুঁশ ফিরলে নিজেদের ঝুপড়িতে ফিরে যাবে। আর, প্রত্যন্ত জঙ্গলে বসবাসকারী ঐসব আদিবাসীদের যেকোনো আনন্দ, উৎসব উদযাপনের দুটোই বহিঃপ্রকাশ - হাঁড়িয়া আর সেক্স। ভেবে দেখুন, এই দুটো ছাড়া নিজস্ব বলতে ওদের কিন্তু আর কিছু নেই'।

২৩/১২/২০২৩

****

সাতশ পাহাড়ের দেশে (২)

চাকরীতে আমার প্রথম পোস্টিং ছিল জামশেদপুর। একদিন সকাল সকাল অফিসে গিয়েছিলাম। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব। গন্তব্য একশ সত্তর কিলোমিটার দূরে, পাহাড় আর শালের জঙ্গলে ঘন সবুজে ঢাকা, প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফিট ওপরে সারাণ্ডার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়চূড়ো, তদানীন্তন বিহার, পরবর্তীকালের ঝাড়খন্ড রাজ্যের সিংভুম জেলার কিরিবুরু।

রাস্তা বলতে সিঙ্গল রোড। তাতে অসুবিধে হতো না। কারণ সেইসময়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং সীমিত কয়েকটি স্টেট হাইওয়ে ছাড়া সব রাস্তাই সিঙ্গল রোড হতো। অসুবিধা হতো চাইবাসা থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার রাস্তার পুরোটাই ছিল ভাঙাচোরা। আমরা ভালোবেসে ঐ রাস্তাটার নাম দিয়েছিলাম হাম্পটি ডাম্পটি রোড। সেবারের ট্যুর ছিল একটু লম্বা। কিরিবুরুতে সেল-এর মাইন্স অফিসে যাব। তারপর ওদেরই মেঘাহাতাবুরু মাইন্স অফিস এবং শেষে ইস্কো-র চিড়িয়া মাইন্স অফিস ঘুরে তিনচারদিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব, জামশেদপুর। অন্তত, সেরকমই ঠিক করে বেরিয়েছিলাম।

জামশেদপুর থেকে চাইবাসা পর্যন্ত রাস্তা বেশ মসৃণ। সেটি টাটানগর ষ্টেশনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে প্রথমে পৌঁছে দেয় জেলাসদর চাইবাসা। সেখানে নিজের চেহারা পাল্টে, আমাদের আদরের হাম্পটি ডাম্পটি রোড হয়ে ঝিঁকপানির

এ.সি.সি সিমেন্ট কারখানার গা ঘেঁষে, হাতগামারিয়া, জগন্নাথপুর, নোযামুণ্ডি হয়ে বড়াজামদা পৌঁছে দেয়। টাটানগর থেকে বড়াজামদা যাওয়ার রেললাইনের ওপর গুনে গুনে সাতটা লেভেলক্রসিংয়ের সঙ্গে কাটাকুটি খেলতে হয়। স্থানীয়রা বড়াজামদাকে জামদা বলে ডাকে। সেই জামদা থেকে প্রথম বাঁদিকের রাস্তা ছেড়ে আরও কিছুটা সোজা এগিয়ে দ্বিতীয় বাঁদিকের রাস্তা ধরব। সেখান থেকে আঠেরো কিলোমিটার পুরোটা খাড়াই ঘাট সেকশন দিয়ে উঠে গিয়ে কিরিবুরু। রাস্তা ভালো হলেও খাদের দিকটায় তখন কোনো গার্ড-ওয়াল ছিল না, একেবারে ন্যাড়া। অপরদিকটা কনুই ঘষটানো খাড়া পাহাড়। সবচেয়ে মুস্কিল হতো ডাম্পার ট্রাকগুলোকে নিয়ে। ঐসব ড্রাইভাররা ব্রেক ব্যবহার করাটাকে বোধহয় পাপ হিসেবে গণ্য করত। প্রধানত একমাহ ঐ কারণে কিরিবুরুতে রাতে থাকার ব্যাপার থাকলে আমরা চেষ্টা করতাম সূর্য ডোবার আগে সেখানে পৌঁছে যেতে। দেরি হলে নীচে জামদা থেকে প্রথম বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে পাঁচ কিলোমিটার মতো দূরে উড়িষ্যার বারবিলে পৌঁছে সেখানে রাত্তিরটা থেকে যেতাম।

চাকরির শুরুতে আমার প্রথম যে জ্ঞানটির প্রাপ্তি হয়েছিল সেটি ছিল অফিসের সঙ্গে বাঘের খাঁচার কোন পার্থক্য নেই, একবার খাঁচায় ঢুকে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসাটা কখনো নিজের হাতে থাকে না। সেদিন যথারীতি আমারও বেরিয়ে আসতে দুপুর হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সেদিনআর কিরিবুরু পৌঁছনোর চেষ্টা না করে ঠিক করেছিলাম রাত্তিরটা বারবিলে কাটিয়ে পরেরদিন সকালে যাব কিরিবুরু, 'হিলস্ অফ্ এলিফ্যাণ্টস্'। তারপর ওখান থেকে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার

নেমে আড়াই হাজার ফিটের আরেকটা পাহাড় মেঘাহাতাবুরু, 'হিলস্ অফ্ ক্লাউডস্'। সেখানেও কাজ ছিল।

বারবিলে গিয়ে উঠেছিলাম ওখানকার মেন রাস্তার ওপর পি.ডবল্যু.ডি গেষ্টহাউসে। কেয়ারটেকার সন্তোষ পরিবার নিয়ে থাকত। গেষ্টদের জন্য রান্নাটান্না স্বামী-স্ত্রী মিলে ওরাই করে দিত। আগে থেকে বুকিং টুকিং করতাম না বা করার সুযোগ ছিল না। ঘর খালি থাকুক বা না থাকুক, দশ টাকা নিয়ে সন্তোষ ওখানে যেমন করে হোক থাকার একটা ব্যাবস্থা করে দিত। একবার এক বর্ষার বর্ষার সময় আমি একটু রাত করেই পৌঁছুতে পেরেছিলাম। কোনো ঘর খালি ছিল না। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কি করব, কি করব ভাবছিলাম। একটু দূরে সরে গিয়ে সন্তোষ বউয়ের সঙ্গে কিসব আলোচনা করল। তারপর এসে বলল এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় আর যাবেন। ভেতরে আসুন। মাটিতে শুতে হবে কিন্তু। ডাইনিং রুমে মাটিতে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে সুন্দর শোয়ার ব্যাবস্থা করে দিয়েছিল। আলুসেদ্ধ আর ডিমের ওমলেট দিয়ে পরোটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতের খাওয়া সাধারণত হতো বারবিলের বিখ্যাত এবং একমাত্র খাবার জায়গা, সর্দারজীর হোটেলে। ঐ হোটেলে আমার বরাবরের বাঁধা মেনু ছিল তন্দুরি রুটির সঙ্গে কিমা-কলিজি। স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে, সর্দারজীর চেহারাটাও মনে আছে, যদিও সর্দারজীর নাম অথবা হোটেলের নাম কোনোটাই অনেকদিন আর মনে পড়ে না।

পরের দিন সকাল সকাল কিরিবুরুর জন্য রওনা দিলাম। মনের ভেতর একটা খচখচে ভাব ছিল। কারণ একে প্রথমবার পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে হবে, তার ওপর ড্রাইভার হিসেবে তখনও আমার হাত অতটা পাকা হয়নি। তাছাড়া সঙ্গে দ্বিতীয়জন কেউ নেই। যাকগে, সবরকম সমস্যা আর চিন্তা

মাথায় নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম। জামদা ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে কিরিবুরুর জন্য ওপরে ওঠার রাস্তা শুরু।

কয়েকমাস আগে প্রথমবার গুয়া যাওয়ার সময় উপলব্ধিটা হয়েছিল। শালের জঙ্গলে ঢাকা, নিশ্ছিদ্র সবুজ পাহাড়ে মোড়া সারাণ্ডার জঙ্গল নিজেকে কারুর সামনে মেলে ধরতে চাইলে তাকে প্রস্তুতির সময় দেয় না, হঠাৎকরে সম্পূর্ণ বেআব্রু হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। এবারও ঠিক তাই হল। বাঁদিকে মোড় ঘুরতেই নিজেকে আচমকা পেলাম নগ্নসৌন্দর্য্যে ভরা এক সারাণ্ডার মধ্যে। সেই মুহূর্তে, সেই চোখ ঝলসানো প্ররোচনায় পূর্ণ দৃশ্য থেকে চোখ সরানোর উপায় অথবা অবলম্বন, দুটোর কোনটাই আমার ছিল না। ঘোর কাটিয়ে খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছিলাম। চড়াইয়ে উঠতে থাকার সাথেসাথে শালগাছেরা আস্তে আস্তে গার্ডওয়ালের পাশ দিয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে একসময় মিলিয়ে গেল। তাদের মিলিয়ে যাবার মুহূর্তের সাথে মুহূর্ত মিলিয়ে চোখের সামনে পর্দায় ভেসে উঠেছিল চারদিকে হাল্কা সাদাটে, ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের পলেস্তারার ভেতর ঢেউ খেলিয়ে হেঁটে বেড়ানো শুধু পাহাড় আর পাহাড়। দৃষ্টির শেষ সীমানা পযর্ন্ত শুধু সেই দৃশ্য। সাদা, সবুজ আর নীল রং মিলিয়ে তৈরি অজস্র সব নাম-না-জানা রঙের সে কী দিগন্তবিস্তৃত এক ক্যানভাস! একটানা কিছুক্ষণধরে দেখতে দেখতে, সারা শরীর জুড়ে কিরকম এক বিচিত্র অনুভূতি গ্রাস করেছিল। সে অনুভূতি অনেকটা নেশাগ্রস্তের আড়ষ্টতার মতন, অবশতার মতন। এই ছিল সেই চরম মুহূর্ত, যখন থেকে প্রকৃতির প্রতি আমার অনুরাগ গভীর হতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত করেছিলেন ”......সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা.....”।

আড়ষ্টতা কাটিয়ে সম্বিত ফিরেছিল ওপর থেকে একটার পর একটা লাইন দিয়ে নেমে আসা গোটা দশেক ডাম্পার ট্রাকের বিরক্তিকর একটানা হর্ণের আওয়াজে। ড্রাইভারদেরও বিরক্তি ছিল। টেনেটুনে দুটো গাড়ির চলাচলের মত চওড়া হলেও রাস্তাটা বেশ খাড়াই। তারমধ্যে ওদের ব্যাস্ততাময় সকালে, যখন ওরা কাজের তাগিদে ওপর থেকে নীচে যাওয়া আসা করছে, তখন আমার মত অপটু এক ড্রাইভার একটা অ্যামবাসেডার গাড়ি নিয়ে নীচ থেকে টুকটুক্, টুকটুক্ করে ওপরে উঠছি, তাও আবার সারাণ্ডার প্রেমের মৌজ নিতে নিতে। এরকম পরিস্থিতিতে যেকারোর পক্ষে বিরক্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক। ওরা, মানে ঐ অঞ্চলের ড্রাইভার, খালাসি ইত্যাদি, সবাই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। ওদের সারাণ্ডা আর আমার সারাণ্ডা এক নয়, এক হতে পারে না। ওদের সারাণ্ডা আমার মতো দুদণ্ড দাঁড়িয়ে মৌজ করার জিনিস নয়। ওরা জন্মেছে সারাণ্ডায়, ওরা সৃষ্টি করে সারাণ্ডায়, ওরা মরে সারাণ্ডায়। সারাণ্ডার জঙ্গল, বৃষ্টি, পাহাড়, রোদ, রঙ, পশু, পাখি, হাওয়া, বাতাস সবকিছু মিলিয়ে ওদের রক্তমাংস, ওদের শ্বাসপ্রশ্বাস, ওদের সাধআহ্লাদ, ওদের পরিবার, ওদের পরিজন। আসলে এই সব মানুষেরাই সারাণ্ডা!

সকাল দশটা নাগাদ কিরিবুরু পৌঁছেছিলাম। সারাদিন কেটে গিয়েছিল ওখানকার আর মেঘাহাতাবুরুর অফিসের কাজকর্মে আর পাঁচমিশেলি গল্পগুজবে। বিকেল চারটেয় অফিস ছুটি। স্টিল অথরিটির গেষ্টহাউসে আমার রাত্রিযাপন। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়, পশ্চিমমুখো দোতলা গেষ্টহাউস। সামনে লাগোয়া গাঢ় সবুজ লন্। ইতস্তত কয়েকটি টেবিল আর কিছু গার্ডেন চেয়ার সেই লনে ছড়ানো। একেবারে সামনের দিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা শক্তপোক্ত বাউণ্ডারী। রেলিংয়ের গা

ঘেঁসে নেমে গেছে অতল খাদ। ঝুঁকে দেখতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে। শেষ বিকেলের সূর্য দিগন্তের একেবারে শেষে সীমারেখায় পাহাড়গুলোর চূড়ায় চূড়ায় পায়চারিতে ব্যস্ত, সারাদিনের কাজ শেষে সেদিনের মতো বিশ্রামে যাবার প্রস্তুতিতে।

চা দিতে বলে রুমে গিয়ে অপেক্ষা করছিলাম চায়ের অপেক্ষায়। বেশ খানিকটা পরে বেয়ারা এসেছিল, খালি হাতে। চা লনে সার্ভ করে দিয়েছে বলে জানাল। চলে যাবার আগে কয়েক সেকেন্ডের জিজ্ঞাসাপূর্ণ একটা চাউনি দিয়ে, নিঃশব্দ আওয়াজে বলে গেছিল 'আজব লোক হে তুমি! এত আলো আর রঙ দিয়ে কেয়ারি সাজানো এই শেষ বিকেলে ঘরের ভেতরে বসে কেউ চা খায়'? বাইরে গিয়ে বসেছিলাম লনের শেষপ্রান্তে রেলিং ঘেঁসে রাখা একটা গার্ডেন চেয়ারে। সামনে টেবিলে রাখা ছিল টী-কোজী ঢাকা টী-পটে চা আর সঙ্গে কিছু নোনতা। সূর্য অস্ত গেছে তার শেষ রশ্মির আভাটুকু রেখে দিয়ে। এই জায়গাটা থেকে শালগাছ দেখা যায় না। তারা থাকে অনেক নীচে। ইতিমধ্যে কাছের, দূরের সব পাহাড়গুলোয় কালচে রঙ ধরেছে। গোধূলীর সেই চিরকালীন বিষণ্ণ আলোয় সারাণ্ডা তার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে তখন কিছুটা বিমর্ষ।

পরেরদিন কাকভোরে উঠে লনে গিয়ে আগেরদিন বিকেলের সেই চেয়ারটায় বসেছিলাম। লোভ ছিল সারাণ্ডার নিদ্রাভঙ্গ দেখার। সেই ভোরে দেখেছিলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে দেখেছিলাম কি অদ্‌ভুতভাবে প্রায় অন্ধকারে, ধীরে ধীরে প্রথমে পাহাড়গুলোর রূপরেখা ভেসে ওঠে। তারপর, সময় এগনোর সাথে সাথে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, আস্তে আস্তে তাদের শরীরে রঙের ছায়া পড়তে শুরু করে। সেই ছায়া খুব তাড়াতাড়িতে একটার পর একটা রঙ পালটায়। শেষে পুরো

ক্যানভাস সূর্যের আলোয় আর তার রঙে হঠাৎকরে ভরে যায়। অদ্‌ভুতরকম শান্ত, স্নিগ্ধ এক ক্যানভাস। পাহাড়দের ঘুম ভাঙ্গা সেই আমার প্রথম দেখা।

ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিয়েছিলাম চিড়িয়ার উদ্দেশ্যে। চিড়িয়া! সারাণ্ডার সে এক অন্য সন্তান।

গুয়া থেকে মোটামুটি চল্লিশ কিলোমিটার মতো আরও গভীর জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে চিড়িয়া। ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ লৌহ খনিজের ভাণ্ডার। গহীনের সেই সারাণ্ডার সৌন্দর্য ক্ষমাহীনভাবে নগ্ন, প্রদাহী, ভয়ানক। শুনেছিলাম অতি সামান্য সংখ্যক, নজরের বাইরে থাকা কিছু আদিবাসী এত গভীরে থাকে। এখানে নিশ্চিন্তে বাস করে সংখ্যহীন হাতি, বনযশূয়োর, বনমুরগী আর অজস্র প্রজাতির পাখি। লোকমুখে শোনা যায় এত পাখি থাকে বলে এই জায়গার নামকরণ হয়েছিল চিড়িয়া।

প্রায় আড়াই-তিনহাজার ফিটের কাছাকাছি উচ্চতার, যমজ ভাইয়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুই ‘বুরু’, অর্থাৎ পাহাড় - বুধাবুরু এবং বায়চিংড়িবুরু। মধ্যিখানের উপত্যকায় চিড়িয়া। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কয়রা নদী, আর গা ঘেঁষে বয়ে গেছে হামসদাগর নালা। বাইরের পৃথিবীতে যাওয়া আসার দুটি রাস্তা। তিরিশ কিলোমিটার মতো দূরে, সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের চক্রধরপুর আর রাউরকেল্লা ষ্টেশনের মাঝামাঝি মনোহরপুর ষ্টেশন। অন্য রাস্তাটি নিয়ে যায় প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে আমাদের গুয়া। সত্যি কথা বলতে গেলে, ‘রাস্তা’ সেরকম কিছু ছিল না বললেও খুব একটা ভুল বলা হবে না।

আমি কিরিবুরু থেকে চিড়িয়া গিয়েছিলাম গুয়া হয়ে। গুয়া পৌঁছে ওখানকার পারচেজ ম্যানেজার, আমাদের বন্ধু রামালিঙ্গমের সাথে দেখা করে জানতে পারলাম এদিক দিয়ে

প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে চিড়িয়া যাওয়ার পারমিশন নেই। তবে অন্যভাবে যাবার দুটো উপায় আছে। এক, ইস্কোর জিপে করে, নাহলে মালগাড়ির ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়িয়ে। মালগাড়িগুলো চিড়িযা থেকে গুয়া পর্যন্ত আকরিক বয়ে আনে, সারাদিনে দুতিনবার আসাযাওয়া করে। সময় কম লাগে বলে কর্মচারিদের কাছে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটা পছন্দের ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছে বা লোভ ছিল একটু অন্যরকম। জঙ্গলের রাস্তায় বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়া যাবে বলে আমি চাইছিলাম জিপ নিয়ে যেতে। আমার নতুন প্রকৃতিপ্রেম আরও খানিকটা মজবুত করতে, সেদিন না পারলেও পরের দিন সাহায্য করেছিল রামা। একদিনের জন্য নয়, পুরো দুদিনের জন্য জিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। জিপের ব্যাবস্থা হয়ে যেতেই আমরা রওনা দিয়েছিলাম। সারথী ছিল বছর পঞ্চাশের শংকর টোপনো। আমাকে ওরা সামনের সিটে বসতে দেয়নি। খুব আগ্রহ সহকারে ফিসফিস আওয়াজে আমাকে জঙ্গল চেনাচ্ছিল। জঙ্গলে ওর সব অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্প বলছিল। সঙ্গের দ্বিতীয়জন কিন্তু একদম চুপচাপ। লক্ষ্য করছিলাম সামনে বসে সে সারাক্ষণ ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বোলাচ্ছে, মনে হচ্ছিল ঠিক যেন ঘন জঙ্গলের ভেতর কিছু একটা খুঁজছে। বিভ্রান্তি দুর করেছিল টোপনো। রাস্তা বলতে পুরোটাই ছিল নামে মাত্র রাস্তা, গাড়ি চালাতে চালাতে চালকদের রাস্তা থেকে চোখ সরানোর উপায় ছিল না। মৌন ব্যাক্তিটির কাজ ছিল চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে হাতি বা বুনোশূয়োর দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে চালককে সাবধান করা। তারপর দুজনে মিলে পরিস্থিতি বুঝে ব্যাবস্থা নেওয়া। টোপনোর কাছেই জানতে পেরেছিলাম চিড়িয়ার রাস্তায় যেকোনো গাড়িতে ড্রাইভারের সঙ্গে

আরেকজন না থাকলে ট্রিপের পারমিশন দেওয়া হয় না। যতদুর মনে পড়ে দ্বিতীয় লোকটির নাম ছিল দিলীপ। নামটা সঠিক নাও হতে পারে।

নিশ্ছিদ্র জঙ্গলের মধ্যে চারদিকে অজস্র পাখির বিভিন্ন স্বরের ও সুরের ডাক, টোপনোর ফিসফিস আওয়াজে কথা বলা আর সারাণ্ডার নিস্তব্ধ নীরবতার মাঝে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ঐভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, তবে গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে সম্বিত ফিরেছিল। দিলীপকে দেখলাম বিড়ালের মত নিঃশব্দে নেমে জিপের সামনের দিকটায় গিয়ে নীচু হয়ে কিছু একটা করতে। পেছনের সিটে বসে থাকার কারণে ওখানে ঠিক কি করছিল দেখতে বা বুঝতে পারিনি। আমাকে উসখুস করতে দেখে টোপনো ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা না বলতে ইশারা করেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা দুজনে নিজেদের ভাষায় খুব নীচু স্বরে কিছু কথাবার্তা বলে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে চিড়িয়া পৌঁছে দিল। ওখানে পৌঁছনোর পর দিলীপের কাছে জানতে পারলাম রাস্তার মাঝখানে হাতির বিষ্ঠা দেখে গাড়ি দাঁড় করানো হয়েছিল। ও নেমে গিয়ে সেই বিষ্ঠা ছুঁয়ে তাপমাত্রা বোঝার চেষ্টা করছিল। তার থেকে আন্দাজ করে নিয়েছিল হাতির দল তখন খুব কাছে না হলেও খুব একটা দূরেও ছিল না। যদি ওরা বুঝত হাতিরা খুব কাছাকাছির মধ্যে আছে, তাহলে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আমাদের গুয়া ফিরে যেতে হতো। তারপর সেখানে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে হতো পরের খবরের জন্য কবে, কখন হস্তিযূথ অন্য জায়গায় সরে গেছে। ততক্ষণ বা ততদিন পযর্ন্ত গুয়া - চিড়িয়া রাস্তা বন্ধ।

চিড়িয়াতে যথারীতি ইস্কোর গেষ্টহাউসে উঠেছি। অন্য কোনো থাকার জায়গাও ছিল না তখন। সামনে, পেছনে, আশেপাশে

তাকালে শুধু শালগাছের জোয়ার। গাছের কাণ্ডগুলো তো দেখাই যায় না, অনেক উঁচু পর্যন্ত নানারকমের জংলী গাছগাছড়া, গুল্মলতা দিয়ে মোড়া। শালের মাথার ওপর দিয়ে তাকালে বোঝা যায় একদিকে বুধাবুরু আর অন্যদিকে বায়চিংড়িবুরু দুদিক থেকে কিভাবে চিড়িয়াকে সযত্নে আগলে রেখেছে। সন্ধ্যের সময় লনে গিয়ে বসেছিলাম, সামান্য ঠাণ্ডার আমেজ গায়ে মেখে। মলমলের মতো নরম চাঁদের আলোর পাতলা সবুজ আভায় জড়ানো চার দিক। সামনের ট্রেতে সৌখিন ডিজাইনেরপেয়ালা-পিরিচে রাখা গরম সুগন্ধি চা আর কিছু টুকটাক মুখরোচক। খানিক দূরে, একটু নীচের দিক থেকে ভেসে আসছিল সেই কবে ঊনিশসো সাল নাগাদ সাহেবদের এখানে আনা ষ্টীম ইঞ্জিনের সান্টিং করার হাল্কা আওয়াজ। পাশ থেকে ভেসে আসছিল হামসদাগর নালা দিয়ে একটানা বয়ে যাওয়া পাহাড়ি জলের কুলকুল শব্দ। খোলা আকাশে লক্ষকোটি মণিমুক্তো হয়ে জ্বলজ্বল করছিল আকাশভর্তি তারা। হাত বাড়ালে হয়তোবা তাদের ছোঁয়া যেত।

প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো সেই সন্ধ্যেয়, শুধু সেই সন্ধ্যেটুকুর জন্য হলেও, আমি ছিলাম ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন মষ্‌তিস্ক নিয়ে বসে থাকা, বোধশক্তিরহিত এক মুক্ত মানুষ।

১৯/০১/২০২৪

****

বউ

এই কাহিনীর পটভূমিকা ঊনিশ শতকের পাঁচের দশকের কোন একটা বছর। মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সেটা এমন একটা সময় ছিল যখন অনেককিছু আমাদের বর্তমান সময়ের থেকে আলাদা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সে যুগে গেরস্ত বাড়ির রান্নাঘরে হেঁসেল থাকত, কিচেন স্ল্যাব নয়। ডাক্তারের সঙ্গে কম্পাউণ্ডার থাকত, রিসেপসনিষ্ট নয়; দিদিমনি থেকে ম্যাম্ হতে স্কুলের শিক্ষিকাদের তখনও বহু দেরি। মধ্যবিত্ত রান্না উনুনে হত, গ্যাসে নয়। খেতে বসে প্রথম পাতে আমরা চচ্চড়ি খেতাম, মিক্সড্ ভেজিটেবল নয়। বহু দিদিমা-ঠাকুমাদের শরীরে শীতকালে আর্থ্রারাইটিসের ব্যাথা হতো না, তাঁরা বাতের ব্যাথায় ভুগতেন। তেমনই আবার অনেক দাদু-ঠাকুর্দা বিকেলের দিকে ইনডাইজেশনে নয়, অম্বল বা গ্যাসের অস্বস্তিতে কাবু থাকতেন। এসবের বাইরে গিয়েও দৈনন্দিন এবং পারিবারিক জীবনযাত্রার আরও হাজারটা সামাজিক প্রথা বা নামের মধ্যে বহুকিছু সময়ের নিয়ম মেনে, বিবর্তনের হাত ধরে ক্রমাগত হয় হারিয়ে গেছে অথবা পাল্টে যাচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া এইরকম সব প্রথাগুলোর মধ্যে একটি মোটামুটিভাবে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রথা খুব বেশি করে আমার নজর কাড়ে। ঐসব সময়ের বেশিরভাগ সন্তানসম্ভবা মেয়েরা সন্তান প্রসবের প্রাক্কালে বাপের বাড়ি চলে আসত এবং সন্তানদের জন্ম সেখানেই হতো। একটু ফিরে তাকালে দেখা যায় আমাদের, আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের এবং তারও আগেকার সবার না হলেও, বেশিরভাগেরই জন্মস্থান ছিল মামাবাড়ি।

আমার মামাবাড়ি ছিল এক গেরস্ত বাড়ি। সেই বাড়িতে পারিবারের সদস্য বাস করতেন সাকুল্যে তিনজন। বাড়ির ঝি, চাকর, গোয়ালা, জলের ভারি ইত্যাদিসব মিলিয়ে আরও জনা চার-পাঁচ। অনেকসময় দাদামশায়ের দূর থেকে অনেক রাতে এসে পৌঁছনো মক্কেলদের কয়েকজন থাকত বাড়ির বৈঠকখানায়। তাছাড়া তখনকার প্রচলন মোতাবেক কাছের, দূরের সবরকম আত্মীয়স্বজনের যাওয়াআসা তো সবসময় লেগেই থাকত। এককথায় বলতে গেলে মামাবাড়ি ছিল সবসময়ের ভরাট এক গেরস্ত বাড়ি। সাধারণ দিনগুলোতে দুপুরবেলা নিয়ম করে পাত পড়ত অন্তত জনা দশ-বারোর।

আমাদের আজকের গল্প আরম্ভ উনিশ শতকের পাঁচের দশকের কোনো একটা বছরের ভরা গ্রীষ্মে। আমার মা তার বাপের বাড়িতে আছেন, প্রথম সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষায়। বাড়িতে কুড়ি-পঁচিশ বছরের পুরনো ঝি আমোদিনী। দোর্দণ্ড প্রতাপশালিনী, একাই-একশ ধরণের দশভূজা এক জাঁদরেল মহিলা। মা বাপেরবাড়ি পৌঁছনোর পরে বাড়ির সবাইকে মায়ের পরিচর্যার দিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির বাকি সমস্ত দৈনন্দিন কাজ এবং দায়িত্ব আমোদিনী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।

সকালের সমস্ত কাজ শেষ করার পর, স্নান সেরে ভাত খেয়ে একতলার বারান্দার আলো-আঁধারি কোনায় আমোদিনী প্রতিদিন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিত। নতুন আগমনের অপেক্ষায় সবরকম ব্যবস্থা তখন মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কাউকে কিছু না বুঝতে দিয়ে, সবার অজান্তে গ্রীষ্মের সেই দুপুরে আমোদিনীর ঘুম আর ভাঙেনি। আমোদিনী মারা গিয়েছিল। ঐরকম অকূলপাথার পরিস্থিতির দিশেহারা সময়ে খড়কুটোর

মতো কোথা থেকে যেন ভেসে এসেছিল বউ। আমাদের আজকের গল্প এখানেই শুরু।

আমার মামাবাড়ীর শেষ স্থায়ী ঝি ছিল বউ। আমাদের সবার কাছে বউ, আর বাইরের লোকের কাছে ছলোর মা। একটানা বছর তিরিশ কাটিয়েছিল, আক্ষরিক অর্থেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। গায়ের রঙ ময়লা, ছোটখাটো গাট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ। পরনে সবসময় মোটা কাপড়ের সরু পাড় সাদা শাড়ি, ঋতু নির্বিশেষে কনুই পযর্ন্ত হাতঅলা ঢিলেঢালা গলাবন্ধ ব্লাউজ, ডান হাতে পেতল বা ঐ জাতিও কিছুর তৈরী সরু ক্ষয়াটে একটা চুড়ি এবং মাথায় সর্বক্ষণের আধ-ঘোমটা। আমরা হাসাহাসি করতাম বউ নিশ্চয় ঘোমটা পরে ঘুমোতে যায় বলে। খুব ভোরবেলা ষ্টেশনের দিক থেকে টাঙ্গা গাড়িগুলো বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত শুরু করার আগে আমাদের বাড়ির রকের সিঁড়িতে ঝাঁট পড়ার আওয়াজ উঠত। আমরা বুঝতে পারতাম বউ কাজে এসে গেছে। বাড়ি যেত সন্ধ্যেবেলা শাঁখ বাজার পরে। ঐটুকু চেহারার একটা মানুষ ওই বিরাট তিনতলা বাড়ি কীভাবে দিনের পর দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত সেটা আজও আমাকে অবাক করে। তার সঙ্গে ছিল বাসনমাজা, কাপড়কাচা ছাড়াও সারাদিনের অগুন্তি ফাইফরমাস এবং গেরস্ত বাড়ির আনুষঙ্গিক হাজার রকমের কাজ।

সকালের চা দুটো বাসি রুটি দিয়ে খেত। পাঁউরুটি ছিল একেবারেই অপছন্দের। দিনের শুরুতে মুড়ি খেতে চাইত না, মুড়ি খেতে অনেক সময় লাগে বলে। অগত্যা বাসি রুটি। তারপর সকালের সব কাজকর্ম সেরে বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ সাদা রঙের নীল বর্ডার দেওয়া কানাউঁচু

এনামেলের থালায় সরষের তেল দিয়ে মাখা একথালা মুড়ি, কাঁচালঙ্কা আর অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে আধ গেলাস চা দিয়ে জলখাবার সারত। আধ গেলাসের বেশি চা কখনো খেত না, কারণ অতটা চা খেলে ওর নাকি 'গেস হয়, পেটটা দুখায়'। সবচেয়ে অপছন্দের ছিল লুচি বা পরোটা। যেদিন লুচি বা পরোটা থাকত সেইসব সকালগুলোতে খাওয়ার শেষে মুখসুদ্ধির জন্য দু-এক মুঠো মুড়ি নিত।

বেড়ে ওঠার বয়েসে অল্পস্বল্প বদমায়েশিগুলোর জন্যে বউ আমাদের বকাবকি করত। আমরা কখনো ওর কথা শুনতাম, কখনো শুনতাম না। না-শোনাগুলোর পেছনে কোনোদিন কোনোরকম অশ্রদ্ধার জায়গা ছিল না। আবার সেইসব বদমায়েশিতে বিন্দুমাত্র অসভ্যতার গন্ধ পেলে দিদিমণি অর্থাৎ মাকে বলে দেওয়ার ভয় দেখাত। তাতে ওষুধের মতো সঙ্গেসঙ্গে কাজও হতো। এত বছর ধরে দেখেছি, তবু বউকে কখনও সেরকম রেগে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের ভাইবোনদের ওপর যখন চড়থাপ্পড় পড়ত একমাত্র তখন দেখতাম নিজের মনে অনেক্ষণধরে নিচু স্বরে গজগজ করতে। ওটাই বোধহয় ছিল ওর প্রতিবাদের ভাষা এবং ধরন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহৃত বেশিরভাগ সামাজিক রীতিনীতি, আদবকায়দাগুলো আমরা রপ্ত করি প্রধানত চারপাশের মানুষজনকে দেখে বা অনুসরণ করে। বউকে দেখে শিখেছিলাম মানুষের খেতে বসা, খাওয়ার ধরন, খাবারের প্রতি লোভের বদলে ভালোবাসা কী ভীষণ সব মূল্যবান জিনিস। কত অনায়াসে সবকিছুকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেত আমাদের বউ। জানি না সে নিজে এসব অনুভব করত কিনা। সেটা নিয়ে এখানে মাথাঘামানোর প্রয়োজন নেই।

রান্নার এবং খাওয়ার আলাদা ঘর, ভাঁড়ার ঘর, পুজোর ঘর, আঁতুর ঘর, অফিসঘর আর পাথুমামার (বাড়ির চাকর) ঘর, সবগুলো ছিল একতলায়। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা সবাই দোতলায় চলে যেতাম। নেমে আসতাম শেষ বিকেলে বা সন্ধ্যের শুরুতে। সারা সকালের বেহিসেবি কোলাহলের পরে নিঃঝুম দুপুরগুলোয় একতলাটা ভরে যেত এক শরীর ভারি করা নিস্তব্ধতায়। সাক্ষী হিসেবে থাকত শুধু বউ। বউয়ের বকুনি সত্ত্বেও ওর সঙ্গ ছাড়ত না কয়েকটা কাক, শালিক আর চড়াই, পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াত। পাখিগুলো আসত উঠোনে রাখা এঁটো বাসন খুঁটতে। সেই দুপুরগুলোতে বউকে আমরা চিনতে পারতাম না। কী অদ্‌ভুত হয়ে উঠত বউয়ের চালচলন - শান্ত, ধীর, স্থির, ভারী পদক্ষেপ। ও যেন তখন হয়ে উঠত এক অন্য মানুষ, আমাদের অচেনা বউ। জানতাম মানুষটি কে, কিন্তু চিনতে পারতাম না বা বুঝতে পারতাম না। মনে হতো পরিবেশ যেন সাগ্রহে অপেক্ষা করছে ওর ইচ্ছের জন্য, ওর আদেশের জন্য। পুরো একতলা থমকে থাকত ওর সান্নিধ্যে, ওর প্রতি সম্ভ্রমে। দুপুরবেলার ঐ সময়টুকুর জন্যে বউ হয়ে উঠত স্থান, কাল আর পরিবেশের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।

শীতের দুপুরগুলোতে আমরা ওপরে চলে যাওয়ার পর বউ প্রথমে একটা আলু আর একটা টমেটো নিভে আসা উনুনের ছাইয়ের মধ্যে গুঁজে দিত। তারপর পুকুরঘাটে গিয়ে বাসন মাজতে বসতো। ঘাটের দরজার ওদিকে যাবার অনুমতি আমাদের ছিল না। দরজার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমরা দেখতাম এঁটো বাসন মাজতে মাজতে বউয়ের নিজের সঙ্গে অনর্গল বিড়বিড় করে কথা বলা। চুনোপুঁটি মাছের দল বউকে ঘিরে ভাসতে থাকত বাসনগুলি জলে ডোবানোর অপেক্ষায়, গল্প করত। এঁটোকাঁটা শেষ হয়ে গেলে বউ ওদের চলে যেতে

বলত, ওর না যেতে চাইলে বকাবকি করত। আপনমনে বকবক করাটা যদিও বা বুঝতাম, মাছেদের সঙ্গে গল্প করার ব্যপারটা আমাদের ঐবয়সের মাথায় ঢুকত না। বয়সে পরিপক্কতা আসার পর বুঝতে পারি পুকুরপাড়ে বাসনমাজার ঐ সময়টুকু ছিল ওর নিজের সঙ্গে নিজের সময় কাটানোর, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার করার সময় - ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'মি টাইম'।

বাসন মাজা শেষ করে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে বউ কুঁয়োতলায় অনেক্ষণধরে চান করত। তারপর উনুনের ভেতর থেকে সেই আলু আর টমেটো পোড়া বার করে দুটো একসাথে লঙ্কা, নুন আর সরষের তেল দিয়ে মেখে নিত। খাবার সাজানো থাকত কানা উঁচু নীল বর্ডার দেওয়া সাদা রঙের এনামেলের সেই থালাতে। চূড়ো করে ভাত, ভাত ঘিরে চেপে চেপে বাটির মত গর্ত করে তাতে শাক, তরকারি, মাছ এইসব। ডাল, ঝোল রাখা থাকত বাটিতে। আলু-টমেটোপোড়া সমেত ভাতের থালা নিয়ে এসে বসত উঠোনের লাগোয়া বারান্দায়, শীতের সময় হলে পিঠের ওপর চুলটা এলিয়ে দিয়ে শীতের রোদ পিঠের ওপর ফেলে। এরপরে, প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে বউ যেভাবে খাওয়া সারত, জানি না সেটাকেই কবিতা লেখা অথবা ছবি আঁকা বলে কিনা! সেই খাওয়ার আদাব কোনো ক্ষুধার্তের খাওয়া হতো না। তাতে তাড়াহুড়ো থাকত না, খিদের আবেগ বা তাড়নার লেশামাত্র থকতো না, পেট ভরানোর তাগিদ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, অতৃপ্তির কোন জায়গা থাকত না। ভাগ্যদেবতার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে এ জিনিস আমি প্রায় সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি, একবার নয় দুবার নয়, বহুবার। 'প্রায়' কথাটা ব্যবহার করছি এই কারণে যে বউয়ের প্রবল অস্বস্তি ছিল খাওয়ার সময় কেউ কাছেপিঠে থাকলে।

যখনই আমার দেখতে ইচ্ছে হয়েছে দোতলার সিঁড়ির আড়াল থেকে আমরা লুকিয়ে দেখেছি।

শুনেছি (তবে নিজে পড়িনি, তাই ঠিক বা ভুল জানি না) কোনো একটি উপনিষদে নাকি আছে যে খাওয়া হচ্ছে নিজের আত্মাকে ভোগ দেওয়া। যদি সেটা সত্যি হয়, তাহলে বলতেই হয় আমি এমন একজন মানুষের সান্নিধ্যে অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি যে তার নিজের আত্মাকে ভোগ দিত, প্রতিদিন।

১৪/০১/২০১৮

****

রাতবিরেতে পুকুরপাড়ে

রাতবিরেতে পুকুরপাড়ে।
রাতবিরেতে পুকুরপাড়ে
ছপাত্ ছপাত্ আওয়াজ করে
পায়ের শব্দ ঘোরে ফেরে।
সাথে ঘোরে ছিন্ন কথন
একটু আধটু পরে পরে
সেই আওয়াজের আঙুল ধরে।

রাতবিরেতে পুকুরপাড়ে,
ঘাম জব্জবে শরীরগুলো
ঘুমের খোঁজে দাওয়ায় শুয়ে
নিশাবাতাসের আশা নিয়ে
লাল আকাশের সবুরে থাকে।

পুকুরপাড়ের শব্দগুলো
ঘুমকে তাদের আটকে রাখে।
রাতবিরেতে পুকুরপাড়ে,
ঘুম-ঢুলুনি বন্ধ চোখে
বুঝতে ওরা চেষ্টা করে
পায়ের আওয়াজ কাদের পড়ে।

ভুত না কি চোর!
ভাবতে ভাবতে রাত্রি ভোর।
রাতবিরেতে পুকুরপাড়ে,
মাছগুলো সব বোকা হাঁদা
রুই মির্গেল পুঁটি চাঁদা,
চপলমতি বোঝে না কিছু
খেলাধূলায় মত্ত শুধু।

ভেসে থাকা কচুরিপানা
সবুজ পেখম মেলে জলে
যত্ন নিয়ে আড়াল রাখে।
রাতের শেষে পুকুরপাড়ে,
গাঢ় আকাশ আঁধার হারায়
পায়ের আওয়াজ চুপ হয়ে যায়
টুকরো কথাও শব্দ হারায়।

হঠাৎ আকাশ রঙিন হলো
ঘুম ভেঙে সব মাছগুলো
চিকন্-রূপো মাছগুলো
অস্থিরসব মাছগুলো
জলের ওপর খেলতে এলো।
রাতের শেষে পুকুরপাড়ে,
নিশিভোরের আলোআঁধারে
আধঘুমনো লোকগুলো
পুকুরপাড়ে জড়ো হলো।

জলে ঝপাং জাল পড়লো
মাছগুলো সব জালে এলো।
ভোরের শেষে পুকুরপাড়ে,
কচুরিপানা থেকেই যায়,
ফুলের তোড়ায় জল সাজায়,
পুকুর আবার শান্ত হয়,
নতুন দিনের শুরু হয়।

২০/০২/২০২৬

******

রাইমণি

চাকরিসূত্রে আমার প্রথম পোস্টিং হয় জামশেদপুরে। ঝাঁ চকচকে শহর, রোজ মেশিন দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দেওয়া হয়, লোকজন চেঁচিয়ে কথা বলে না, অজস্র সবুজ বৃক্ষের ভীড়, গাড়ি বা অটো রিকশা বেখাপ্পা পার্ক করা থাকে না। পুরুষরা দেয়াল দেখলে যেখানেসেখানে দাঁড়িয়ে পরে না, লোডশেডিং হয় না, বৃষ্টিতে জল জমে না, নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে গেলে বাড়ি ফেরার দুশ্চিন্তা হয় না। পুরোদস্তুর ঝলমলে এবং নির্ঝঞ্ঝাট এই শহরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে মফস্বলের ছেলে, আমার কিছুটা সময় লেগেছিল।

এত সুখেও আমার শান্তি ছিল না। আমাকে প্রায় আট মাস ধরে একটানা থাকতে হয়েছিল হোটেলে। টাটানগর রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে জামশেদপুর শহরের পথে ডানদিকে ঘুরলে যুগসালাই নামের একটি জায়গা আসে। দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগের দুটো রাস্তা। একই লাইনের নীচে এবং ওপরে একটু তফাতে রেল আন্ডারপাস আর রেল ওভারব্রীজ। ট্রেনলাইন যোগাযোগ রক্ষা করে রৌরকেলা, নাগপুর, মুম্বাইয়র সঙ্গে। রেললাইন পার হলেই শুরু হয় জামশেদপুর শহর। আমার হোটেল - রাণী বোর্ডিং ছিল যুগসালাইয়ে আণ্ডারপাসের কাছে। দৈনিক ভাড়া ১০ টাকা, রাস্তার দিকের রুম নিলে ১২ টাকা। আমি থাকতাম তিনতলায় ভেতর দিকে। জায়গাটার ব্যপারে একটু না বললে আমার অশান্তির সঠিক

কারণটা বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। অজানাদের কাছে এই সীমান্ত পেরোনোর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অনেকটা জাদুকরী মন্ত্র চিচিং ফাঁকের সমতুল্য।

জামশেদপুর শহরে যা যা আছে বা নেই, যুগসালাইতে ঠিক উল্টো ব্যাবস্থা - সেই একই জিনিস নেই বা আছে। কাজে কাজেই, আমার মতো মফস্বলের ছেলের কাছে যুগসালাই তার নিজস্ব শব্দ, গন্ধ, ভাষা, নর্দমা, ধুলোময়লা, সংস্কৃতি নিয়ে অনেক বেশি পরিচিত ছিল। মনের মধ্যে তবুও অশান্তি ছিল। অশান্তির জন্য দায়ী ছিল একটু ভালোভাবে থাকার লোভ বা ইচ্ছে, যাই বলি না কেন। প্রতিদিনের ঘন্টাদশেক ক্যালেন্ডারের ছবির মতো সুন্দর একটা শহরে কাটিয়ে দিনের শেষে যুগসালাইয়ের আট বাই চারের রাণী বোর্ডিংয়ের রুমে ফিরে এসে অসহ্য লাগত, অসহায় লাগত। কিছু করার অর্থাৎ বাসস্থান পাল্টানোর উপায় ছিল না। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াও একটি বড় ধরনের অসুবিধা ছিল। বেশিরভাগ বাড়ির মালিক অল্পবয়েসী ব্যাচেলর পুরুষকে বাড়ি ভাড়া দেবার ব্যাপারে বেশ স্পর্শকাতর ছিলেন, বিশেষকরে তাঁদের পরিবারে যদি অল্পবয়সী মেয়ে অথবা বউ থাকত। ঐরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় রাণী বোর্ডিং অন্তত মাথার ওপর ছাদ দিয়েছিল।

অবশেষে শব্দ, গন্ধ. শান্তি, অশান্তি সবকিছু সত্ত্বেও আট মাস রাণী বোর্ডিংয়ে থাকার পরে জামশেদপুরের অত্যন্ত নাম করা এক পাড়ায় ততোধিক সভ্য, ভদ্র এবং মার্জিত এক পরিবারের ভাড়াটে হয়ে উঠে গিয়েছিলাম। মনে পড়ে অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়ে মনের আনন্দে সারাদিন ধরে ঘর গোছানোর কাজ করেছিলাম, অনেকটা বাচ্চা মেয়েদের পুতুল

খেলার মেজাজ নিয়ে। আসবাবপত্র বলতে একটা ফোল্ডিং খাট আর রান্নার দু-একটা বাসন।

সন্ধ্যের দিকে বাড়িওলি-মাসিমা এসেছিলেন ট্রেতে করে চায়ের সাথে সিঙারা আর মিষ্টি নিয়ে। ট্রে আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন বললেন রাতের খাবার পাঠিয়ে দেবেন। বিষয় থেকে একটু সরে গিয়ে, সম্ভাব্য কৌতূহলীদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি মাসিমা মেসোমশায়ের ছিল দুটি সন্তান - স্কুল এবং কলেজপড়ুয়া দুই ছেলে। কথা বলেই এসেছিলাম আমাকে সপ্তাহে তিন-চারদিন ট্যুরে থাকতে হয়। সেই সন্ধ্যেয় কোনোরকম ভনিতা না করে বললেন এতো ট্যুরের কাজে একজন কাজের লোক রাখা খুব জরুরী। সে এসে রোজ বাসন মেজে দেবে (আমি মোটামুটি রান্না করে নিতাম), ঘরদোর পরিষ্কার করবে আর জামাকাপড় কেচে দেবে। অভয় দিয়ে গেলেন যে উনি ওনাদের কাজের মাসিকে বলে ব্যবস্থা করে দেবেন। সে নাকি খুব ভালো মানুষ। সত্যি কথা বলতে কি হোটেল ছেড়ে বাড়িতে থাকার একটা প্রবল ইচ্ছে তো ছিলই। কিন্তু সেই স্বাভাবিক ইচ্ছের সাথে যে কাজের লোক রাখার একটা সম্পর্ক আছে সেটা কখনো মাথায় আসেনি। সেইকারণেই মাসিমার কাছ থেকে অতবড় সাহায্যের প্রস্তাব পেয়ে একটু দোনামনায় পড়েছিলাম।

পরেরদিন সকালে মাসিমা এলেন, সঙ্গে সেই ভালোমানুষ কাজের মাসি - রাইমণি। মাসিমা নিজেই সূত্রধরের ভূমিকা নিয়ে ওকে বোঝাচ্ছিলেন কি কি কাজ। ভালোমানুষ সেই কাজের মাসিকে দেখে আমি একেবারে স্থাণুবৎ। বয়েস আন্দাজ করতে পারলাম না। চোখ বন্ধ করলে আজও রাইমণির সেই দাঁড়িয়ে থাকাটা দেখতে পাই। গোড়ালি থেকে

কিছুটা ওপর অব্দি পরা আধময়লা সমান্তরাল ডোরাকাটা সুতির সাদা শাড়ি, বেশ ঢোলা গলাবন্ধ ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া নীলরঙের ব্লাউজ, চোখে উঁচু পাওয়ারের ঘোলাটে পুরু কাচের চশমা। চশমার ডান দিকের ডাটি কাপড় জড়িয়ে শক্ত করে সুতো দিয়ে বাঁধা, হাওয়ায় ওড়া শুকনো খড়ের মতো মাথাভর্তি উস্কখুস্ক এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল, খেটে খাওয়া মানুষের সামান্য বেঁকে যাওয়া শরীর। খেই হারানো মানুষের অবাক দৃষ্টি দিয়ে আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল।

সম্বিত ফিরতে কানে এল মাসিমাকে জিজ্ঞেস করছে "কত মাইনে দিবে এই দাদাবাবু"। না ভেবে, মুখফস্কে বলে ফেলেছিলাম "পনেরো"। মাসিমার মাথার অল্প হেলনে বুঝতে পেরেছিলাম ঠিকই বলেছি। রাজী কিনা জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল "কালকে বুল্‌বো। নারানের বাপকে জিগ্গেস করব"। বুঝতে পারলাম মাসিমা একটু অসন্তুষ্ট পনেরতে এককথায় রাজি না হওয়ায়। কিন্তু ওনার কিছু করার ছিল না, করেনওনি। পরেরদিন সকাল সকাল রাইমণি এলো। মাসিমা এবার সঙ্গে নেই। এসে বলল "নারানের বাপ পুনারো টাকায় মানছে নাই।" আমি প্রমাদ গুনছি। সামান্য গম্ভীর হয়ে বললাম "তাহলে তুমিই বলো কত নেবে"। সেই অবাক হওয়া চোখে ডাটি-ভাঙা চশমার ঝাপসা মোটা কাঁচদুটোর ভেতর দিয়ে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ফুলঝাঁটা দিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বলল "এই মাঙ্‌নার বাজারে পুনরো টাকায় কী হয়? উ বঅ্‌লছিল ষল্‌হঅ টাকা লাইগবে"।

২৫/০৭/২০১৮

******

ঋষি

ঋষিকে আমি প্রথম দেখি ১৯৬৪ সালে কালনাতে। শেষবার দেখেছিলাম ১৯৬৫ তে কাটোয়ায়। সেই সময়রে দু-আড়াই বছর আমাদের ঐ দুটো শহরে কেটেছিলো। বেশিটা কেটেছিল কালনায়। এত বছর পরে ঋষির চেহারাটা আমার পরিষ্কার মনে থাকলেও মুখটা প্রায় সম্পূর্ণটাই আবছা হয়ে গেছে।

ঋষির প্রতি বাচ্চাদের বিশেষ একটা আকর্ষণ ছিল যার জন্য আমরা সুযোগ পেলেই ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। চারপাশে পড়ে থাকা জিনিসপত্র দিয়ে প্রত্যেকের জন্য খেলনা বানিয়ে দিত। ছবির মত পরিষ্কার মনে পড়ে আমার বোনকে তৈরি করে দিয়েছিল 'শালিমার'স্ কোকোনাট অয়েলের' টিনের কৌটো দিয়ে একটা উনুনের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ। আমার জন্য একবার দালানের এক কোণে ইঁট আর মাটি দিয়ে তৈরি করে দিয়েছিল বিড়ালের জন্য একটা ছোট্ট বাড়ি - টিনের ছাদ সমেত। আমি বলেছিলাম "আমার তো বিড়াল নেই। ঐ বাড়িতে কে থাকবে"? দুপুরের ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে। দালানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বৃষ্টিতে বেরোতে না পেরে সেই বাড়ির দরজা দিয়ে মুখ বা দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারটে বাচ্চা বিড়াল আর তাদের মা। ঋষি কোথাও থেকে মা আর বাচ্চাদের তুলে এনে দুপুরবেলা আমরা যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন রেখে দিয়ে গেছে। ওর প্রতি অন্য আকর্ষণ ছিল ওর ভাত খাওয়ার ধরনে। সাদা রঙে কানা উঁচু এনামেলের

থালাতে বিয়ের টোপরের মত উঁচু করে সাজানো ধোঁয়া ওঠা ভাত, ভাতের ওপর গোল করে ছড়ানো চার-পাঁচ পলা সরষের তেল, একটা বড় সাইজের আস্ত পেঁয়াজ আর কয়েকটা কাঁচা লংকা। মাছ, মাংস, তরকারি এসবে ঝোঁক ছিল না। সেই বয়েস থেকে ঠিক এইভাবে একদিন ভাত খাবার ইচ্ছেটা পুষে আসছি। ইচ্ছেটা ইচ্ছেই থেকে গেছে। এখন তো শারীরিক সাহসটাই আর নেই।

ঋষি ছিল কালনার ভাদুড়িপাড়ার একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী, ইংরেজীতে যাকে বলে 'ম্যান্ ফ্রাইডে'। গাছের ডাল কাটা থেকে কুঁয়ো খোঁড়া সবই করত একা হাতে। আবার পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে কারোর বাসন ডুবে গেলে ডুব দিয়ে সেগুলো তুলে আনত ঋষিই।

এতসবের মধ্যে থেকে ওর দুটো কারুকার্য খুব মনে পড়ে। প্রথমটা ছিল বামুনদির বাড়ির পাতকুঁয়োতে মুরগি পড়ে গিয়েছিল। বামুনদি ছিলেন একা বিধবা মানুষ। পাঁচ বাড়িতে রান্না করে একার সংসার চালাতেন। পাড়ায় নামডাক ছিল খুব ভালো কাসুন্দি বানাতেন বলে। সরাসরি জলে না পড়ে মুরগিটা কোনরকমে জলের ঠিক ওপরে কুঁয়োতে ওঠানামা করার লোহার একটা আংটাতে নিজেকে আটকে রেখেছিল। বাড়ির এবং পাড়ার লোকজনদের মুরগি উদ্ধারের সবরকমের প্রচেষ্টা ফেল্ হওয়ার পর ঋষির ডাক পড়েছিল। ঋষি কুঁয়োর ভেতরে নামার পরের ঘণ্টাখানেক ধরে ওর আর মুরগির মধ্যে সেখানে যা হলো সেটাকে আমাদের ঐ বয়েসের 'কুমীরডাঙা' খেলা ছাড়া অন্য আর কিছু বলা যাবে না। ঋষি মুরগির কাছাকাছি পৌঁছতেই মুরগি উড়ে গিয়ে অন্য আংটায় বসে, আবার ঋষি সেখানে পৌঁছনোর আগেই মুরগি অন্য আরেকটা জায়গায় উড়ে যায়। শেষমেষ ঋষি হাঁফিয়ে গিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল।

অল্পক্ষণের বিশ্রাম, দু-ঘটি জল আর একটা বিড়ি খেয়ে ঋষি আবার কুঁয়োয় নামল। এবার মুরগির হাঁফ ধরার পালা। কিন্তু মুরগি তো আর বিড়ি খায় না। সে হাঁফিয়ে গিয়ে জলে পড়ে যেতেই ঋষি সাঁতরে সেটাকে ধরে ওপরে তুলে আনল। যাইহোক শেষ পর্যন্ত মানুষ ও মুরগি দুজনেই উঠে আসায় বামুনদি হাঁফ ছেড়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের বাড়িতে শীতকালের এক সকালে। বাড়ির পেছন দিকে একটা বিশাল মাপের তেঁতুল গাছ ছিল, যার নীচটা ছিল আমাদের খেলার জায়গা। খুব হুড়োহুড়ি হতো, সাথে মাটিতে পড়ে থাকা তেঁতুলও খাওয়া হতো। একদিন আমরা ওখানে খেলছিলাম। খেলাটা ছিল পলক না ফেলে সূর্যের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার। যে সবচেয়ে বেশিক্ষণ ঐভাবে থাকতে পারবে সে জিতবে। চোখের পলক পড়লেই আউট। খেলা তখন খুব জমে উঠেছে। চঞ্চল সূর্যের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, বাকিরা তাকিয়ে ওর চোখের দিকে। আমার আর রবির একসঙ্গে নজরে পড়ল একটা বিরাট লম্বা সাদা রংএর সাপ বেশ কিছুটা উঁচুতে তেঁতুল গাছের মোটা একটা ডালের ওপর লম্বালম্বি ভাবে শুয়ে আছে। গায়ে সরাসরি রোদ পড়েছে বলে তার সাদাটে রং একেবারে দুধ-সাদা হচ্ছিল।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সমবেত চেঁচামেচির আওয়াজ পেয়ে বড়রা আসরে নেমেছিলেন। সাপের পরিচয় জানা গেল - দুধক্ষরিস। পরের আলোচনাটা ছিল, যেটুকু মনে আছে, সাপকে কি করে মেরে ফেলা হবে তার একটা পরিকল্পনা তৈরি নিয়ে। এখানে মনে রাখতে হবে যে এই কাহিনী যে সময়কালের সেইসময় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সক্রান্ত

আইনি ব্যবস্থা দূরের কথা, চিন্তাধারারও বোধহয় উৎপত্তি হয় নি।

যাই হোক, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে লাঠিসোটার জোগাড় শুরু হয়েছে, বিশেসজ্ঞদের ডেকে পাঠানো শুরু হয়েছে। ঋষিরও ডাক পড়েছে। ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের ছোটদের সবার পাড়াতুতো দাদু, বড়দের মেসোমশায়। তাঁর চেহারার কিছুই এখন আর আমার মনে নেই। বাড়ির ভেতর অত ভীড় দেখে এসেছিলেন কারণ খুঁজতে। অনেকক্ষণ ধরে সাপটাকে দেখলেন। নিদান দিলেন যে এটা হচ্ছে বাস্তু সাপ, ইংরেজিতে বলা যায় 'রেসিডেণ্ট' সাপ। বাস্তু সাপ কখনও মারা উচিত নয়। তাদের মেরে ফেললে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। সাপটিকে বিরক্ত না করার নিদান দিয়ে দাদু চলে গেলেন। গাছের এবং বাচ্চাদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে সবাই দুধক্ষরিসের ভবিষ্যত নিয়ে দ্বিতীয় দফার আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হঠাৎ ঋষিকে দেখা গেল গাছ থেকে নামছে। ডান হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আছে সাদা রঙের একটা সাপ। সবাই বাকস্তব্ধ, হতবাক।

মাটিতে পা রেখে জমায়েতের পাশ দিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে ঋষি বলে গেল এটাকে মনসা জঙ্গলের কাছে ছেড়ে দেব। এখানে রেখে দিলে ছেলেপুলেরা খেলবে কি করে!

২৪/০৬/২০১৯

******

টোটকা

আজ থেকে বছর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ আগে রাঁচিতে তখনও একটু সবুজ বাকি ছিল, লাইট আর লোডশেডিংএর মধ্যে সারাদিন যে কোনো একটির টিকে থাকার প্রতিযোগিতা ছিল, আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবিতে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় মরুভূমির গরম ছিল। যেটা একেবারেই ছিল না সেটা হচ্ছে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা। এককথায় সবাই ছিল সবার রাজা। আর ইতিহাস সাক্ষী, সব দেশের সব রাজারাই যখনতখন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। ঠিক ঐ সময়টাতে আমি রাঁচিতে থাকতাম। সেখানে আমার পোস্টিং ছিল। কাজকর্মের আহামরি তেমন কিছু চাপ ছিল না। কারণ, ঐ যে বললাম 'সবাই ছিল সবার রাজা'।

সবুজ একটু বাকি ছিল বলে হয়তো বৃষ্টি খুব হত। সেইসমের রাঁচির বৃষ্টি ছিল ভীষণ রোমাণ্টিক আর তার চেয়েও বেশি পুরুষালি। ঐ ম্যাড়ম্যাড়ে টিপ্ টিপ্, ঝিরঝিরির ব্যাপার ছিল না; শুধু ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্। একবার আরম্ভ হলে বন্ধ হবার কোনো নিশ্চিত সময় ছিল না। বিরামহীন একটানা চলতে থাকত দুদিন, তিনদিন, চারদিন। একবার একটানা পাঁচদিন পেয়েছিলাম। সঠিক মনে পড়লে বোধহয় পঁচানব্বই সালের ঐরকম এক বৃষ্টিতে সুবর্ণরেখাকে পাগল হয়ে যেতে দেখেছিলাম।

সেইরকম এক ঘোর বর্ষায় আমাকে দুদিনের সফরে জামশেদপুর যেতে হয়েছিল অফিসের কাজে। আজ সকালে বেরিয়ে পরশু সকালে ফিরে আসা। পৌঁছনোর পরেরদিন সকাল থেকে জামশেদপুরেও মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানা গেল পুরো ছোটনাগপুর অঞ্চল জুড়ে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। তার জেরে এই বৃষ্টি অন্তত দিনতিনেক ধরে একটানা চলবে। এই পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই ছিল। আমরা এসবে অভ্যস্ত ছিলাম। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়জল কোনোকিছুই আমাদের কাজকে প্রভাবিত করতে পারত না। অফিস পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য বোমাটা ফাটলো। কে ফাটিয়েছিল সেটা মনে পড়ে না। জানা গেল ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কোনো এক বা একাধিক সংগঠন সেদিন রাত বারোটা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্‌ধ্‌ ডেকেছে। দক্ষিণ বিহারের ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের রাজনৈতিক উথালপাতালের বছরগুলোর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানবেন ঐসব বন্ধ সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ছিল। মানুষ দূরের কথা, পশুপাখীরাও কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ত। আর 'অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ডাকা হলে সেই বন্‌ধ্‌ আক্ষরিক অর্থেই 'অনির্দিষ্টকাল' চলতো।

ঐ পরিস্থিতিতে যা একমাত্র করনীয় তাই করেছিলাম। অফিসে বসে থাকতে থাকতে আরাম করে এক কাপ চা দুটো বিস্কুট দিয়ে খেয়ে, ঊনিশশো চুয়াত্তর মডেলের অ্যামবাসেডর গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সোজা রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ঘড়িতে তখন বেলা এগারোটা। মুষলাধার বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির জেরে চারদিক ঝাপসা। রাস্তার সবকটা আলো জ্বালানো, মেঘের রঙ আর রাস্তার রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে চারদিক আবছা কালচে আলোআঁধারিতে ঢাকা। রাঁচি পর্যন্ত একশ

তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা একদম সোজা, কোথাও আঁকাবাঁকা নেই। এমনিতে তিনঘণ্টা লাগলেও এইরকম আবহাওয়ায় সাড়েতিন থেকে চার ঘণ্টার লাগবে বলে মনে হল। অঙ্কের হিসেবে বিকেলে তিনটে সাড়েতিনটের মধ্যে রাঁচি পৌঁছে যাবার আশা নিয়ে সেদিন রওনা দিয়েছিলাম।

মিনিট পনেরোর মধ্যে শহরের শেষপ্রান্তে সুবর্ণরেখা ব্রীজ পার হয়ে গেলাম। আড়চোখে নজরে পড়েছিল ক্রুদ্ধ, রুষ্ট সুবর্ণরেখা। যাত্রার একদম শেষে, রাঁচি প্রবেশের ঠিক আগে নামকুম পৌঁছে আবার সুবর্ণরেখা পার করতে হবে। সেখানে তার ক্রুদ্ধতা আরও ভয়ঙ্কর। ব্রীজের ওপারে মান্‌গো ছাড়িয়ে হাইওয়েতে উঠেছি রাঁচির রাস্তা ধরতে। উঠতে না উঠতে গাড়ির ওয়াইপার্‌ শুধু অকেজো হয়েই ক্ষান্ত হল না, একেবারে গোড়া থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে বনেটের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে রাস্তায় পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গেলেও আমি আর গাড়ী দাঁড় করাই নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ঐ অবস্থায় গাড়ি চালাতে কিন্তু খুব যে একটা কিছু অসুবিধা হচ্ছিল তা নয়। মনে হয় অঝোর বৃষ্টির কারণে জল কাচের ওপর বসতে পারছিল না।

যাই হোক, আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। ওয়াইপারের মায়া কাটিয়ে মানসিক দিক থেকে একটু ধাতস্থ হয়ে ধাক্কা খাওয়া আত্মবিশ্বাসটা একটু বাড়িয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। সামনে আসছে চাণ্ডিল-পুরুলিয়া মোড়, রাঁচির পথে প্রথম মাইলষ্টোন। হঠাৎ মনে হলো ব্রেক পেডালটা মাখনে ছুরি চালানোর মতন বসে গেল। সন্দেহ দূর করার আশা নিয়ে ব্রেকের ওপর আবার পা রাখলাম। এবারেও সেই একই ব্যাপার। চাণ্ডিল মোড়ের ঠিক মুখটায় যেখানে একটা রাস্তাটা পুরুলিয়ার দিকে ঘুরে গেছে,

সেখানে চার-পাঁচটা ঝুপড়ি আছে। চাকার হাওয়া চেক্ করা, পাংচার ঠিক করা, ছোটখাটো মেরামতির, মদ, চা এইসবের ঝুপড়ি। একটা ঝুপড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটু অনুরোধ করাতে বছর দশ বারোর একটা ছেলে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বনেট খুলে চেক করতে শুরু করল। তারপর সটান গাড়ির তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কাসব দেখতে লাগলো। ওখান থেকেই হঠাৎ চেঁচিয়ে জানালো ব্রেক অয়েল লিক্ হয়ে গেছে। সেটা শুনে ওর এক সিনিয়র বেরিয়ে এলো একটা ছাতা মাথায় দিয়ে। সিনিয়রের বয়স ষোল-সতেরোর বেশি হবে না। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে সে একই রায় দিল। সারানোর উপায় জিজ্ঞেস করলাম। নির্বিকার চিত্তে নীরসভাবে জানিয়ে দিল কোনো উপায় নেই কিছু করার। এই বৃষ্টিতে মিস্ত্রিরা সবাই বাড়ি চলে গেছে। পরেরদিন থেকে বন্ধের জন্য এই ঝুপড়িগুলোও ‘বন্ধ যব্তক্ চলেগা তবতক্ নেহি খুলেগা’। এইসব বলেটলে দুজনে দৌড়ে গিয়ে ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এতসব কাণ্ডকারখানার মধ্যে ঘড়ির কাঁটা আড়াইটে ছুঁইছুঁই। আবছাকালো আলোআঁধারির মধ্যে মুষলীধার বৃষ্টি ক্ষমাহীন, পাষণ্ডিক, পাশবিকভাবে একটানা পড়ে যাচ্ছে। আমি আর আমার অথর্ব অ্যমবাসেডর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ধারণাহীন। গাড়ি রেখে যাবার উপায় নেই, গাড়ি নিয়ে যাবার উপায় নেই, নিজেকে নিয়ে কি করবো জানা নেই। এইসব সাতপাঁচ যখন ভাবছি, হঠাৎ সেই বছর দশ-বারোর ছেলেটা চেঁচিয়ে আমাকে ওদের ঝুপড়ির ভেতর ডাকল। ভেতরে গিয়ে দেখলাম একটা দড়ির খাটিয়ায় একজন মোটামুটি বেশ বয়স্ক লোক বসে আছে। খাটিয়ার তিনটে পায়া। চতুর্থটার জায়গায় দুটো ফাটা টায়ার গোঁজা আছে। লোকটি

ছেলেদুটোকে একসঙ্গে কোথাও থেকে চা আনতে পাঠাল। ঝুপড়িতে শুধু বৃদ্ধ আর আমি। তার একদমই মত নয় যে গাড়ির এই অবস্থায় আমি রাঁচি যাওয়ার কথা ভাবি। কিন্তু আমার পরিস্থিতি বিচার করে সে বলল গাড়ি চালিয়ে রাঁচি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার একটা টোটকা সে দিতে পারে, তবে একটা শর্তসাপেক্ষে। শর্ত ছিল আমাকে কথা দিতে হবে যে পুরো রাস্তা আমি থার্ড গিয়ারের ওপরে গাড়ি চালাব না। নিরুপায় আমি কথা দিয়েছিলাম। বৃদ্ধ আমার কথায় ভরসা রেখে টোটকা দিয়েছিল। বলেছিল পারতপক্ষে ব্রেক ব্যবহার না করতে। এও বলেছিল 'বিশ পচিস্ মিনট বাদ বাদ' ব্রেকঅয়েলের জায়গায় জল ভরে দিতে। ডিসটিলড্ ওয়াটারের খালি কাঁচের বোতলে এক বোতল জলও দিয়ে দিয়েছিল। চা খেয়ে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় চুপিচুপি অনুরোধ করেছিল টোটকার কথা ছেলেদুটোকে না বলার জন্য, 'ক্যায়া জানে, কব্ কিসি আনাড়িকো বাতা দেগা। বাচ্চা হ্যায় না'!

আমার দেওয়া কথা আর বৃদ্ধের দেওয়া টোটকার ভরসায় আমি রওনা দিয়েছিলাম রাঁচির দিকে, 'যা কপালে আছে হবে' - এইরকম একটা মানসিকতা নিয়ে। রাস্তায় আসে তামাণ্ড, দ্বিতীয় মাইলষ্টোন। গাড়ী দাঁড় করিয়ে চা আর কচুরী খেয়েছিলাম। তারপর তামাণ্ড ছাড়িয়ে আঠারো-কুড়ি কিলোমিটার মোটামুটি খাড়াই ঘাট সেকশন্ পার হয়ে রাঁচি পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যে সাড়েসাতটা-আটটা নাগাদ।

আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল পুরো রাস্তায় ব্রেক মোটামুটিভাবে ঠিকঠাক কাজ করেছিল, এমনকি বুণ্ডু ঘাটিতে ওঠার সময়েও।

দিন কুড়ি পরে, এক ঝকঝকে দিনে এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে জামশেদপুর যাওয়ার সময় সেই ঝুপড়িতে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলাম। ঝুপড়িতে বসে দুটি অল্পবয়সী ছেলে, তিন-পায়া খাটিয়ায় বসে থাকা বৃদ্ধ, আমি এবং আশপাশের ঝুপড়ির জনাকয়েক মিলে একসঙ্গে বসে, দাঁড়িয়ে, বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে রাঁচি থেকে নিয়ে আসা অনেক মিষ্টি খেয়েছিলাম।

০৫/০৬/২০২১

*****

কঙ্কালীতলা

যতদূর মনে পড়ছে সময়টা ছিল পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের কোনো একটা সেমিষ্টার পরীক্ষার মাত্র দিনকয়েক আগে। তৈরি হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা জনাছয়েক ছেলেমেয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ঢুকেছিলাম অনেকটা তুঘলকী কায়দায়, ঝোলাতে আর বগলে ভর্তি বইখাতা নিয়ে। সেইভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায় কলেজের পরীক্ষাগুলো চিরকালই বোধহয় একধরণের অস্তিত্বসঙ্কট, মরণবাঁচন সমস্যা।

বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বইয়ের এবং খাতায় সারাবছরের সব লেখাজোকা মিলেমিশে গিয়ে যাকে বলে একেবারে জেনারেল কম্পার্টমেণ্টের বিশৃঙ্খল ভীড়ের পরিস্থিতি। কিছুতেই যে কিছু হচ্ছে না অথবা করা যাচ্ছে না বুঝতে সময় লাগেনি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমরা একমত হয়েছিলাম যে ব্রেণের ওপর বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে। তার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। অতএব ঠিক হলো দশ কিলোমিটার মতো দূরে, কোপাই নদীর ধারে কঙ্কালীতলা ঘুরে আসার। কাছাকাছি জায়গা, ঘণ্টা দু-তিনের মধ্যে ঘুরে আসা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা পরীক্ষার আগে অত জাগ্রত দেবী কঙ্কালেশ্বরীর আশীর্বাদ প্রাপ্তি হবে।

জায়গা এবং যাওয়া নিয়ে সবাই যখন একমত, তখন জায়গাটা সম্বন্ধে একটু বলতেই হয়। দেশের একান্নটি পীঠের একটি হচ্ছে কঙ্কালীতলা। শিবের তাণ্ডব থেকে ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করতে বিষ্ণু যখন সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করলেন, তখন সতীর কোমর অর্থাৎ কঙ্কাল এখানে পতিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস। সতীর কঙ্কাল যেখানে পতিত হয়, সেই জায়গায় একটি গভীর খাদ তৈরি করে, যা পরে একটি কুণ্ডে পরিণত হয়। মানুষের বিশ্বাস দেবীর মূল দেহাংশ এই কুণ্ডের গভীরেই প্রতিথ রয়েছে। অধিষ্ঠাত্রী দেবী পার্বতী হলেও তিনি এখানে তিনি পূজিত হন দেবী কঙ্কালেশ্বরী নামে। এই মন্দির এবং স্থানটি তন্ত্র সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ, বিশেষ করে প্রতি অমাবস্যায়।

আমরা যেসময় গিয়েছিলাম তখন একটা একটা মেলা চলছিল ওখানে। কিসের মেলা সেটা মনে নেই। এটা আমাদের জানা ছিল যে ইউনিভার্সিটির গা ঘেঁষা রেললাইনের ওপারে যে একটা গাছপালাহীন ধু ধু খোলা একটা মাঠ, সেটা পেরোলেই কঙ্কালীতলা। প্রান্তিক ষ্টেশনের একেবারে ওপাশ থেকে আরম্ভ হয়ে যায় সেই মাঠ। আমাদের দোনামনা করতে দেখে শম্ভু বলেছিল "আরে চল তো! কতো আর দূরে হবে? মায়ের টানেই তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব"। আজকাল খেলোয়াড়দের মধ্যে এই ধরণের উদ্দীপনা তৈরি পৃথিবীর অনেক ক্লাব বা অনেক দেশ বিশেষ কাউকে আলাদাকরে নিযুক্ত করে অনেক টাকাপয়সা দিয়ে। ঐ একই সার্ভিস শম্ভু আমাদের সেদিন দিয়েছিল ফ্রিতে। যাইহোক, শেষমেষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ, মষ্তিস্কের বিশ্রাম, মায়ের টান আর শম্ভুর দেওয়া ভরসা সম্বল করে আমাদের কঙ্কালীতলা যাত্রা শুরু হয়েছিল।

শুরুর দিকটা সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, যেরকমচলে আর কি কলেজের বন্ধুবান্ধবরা একসঙ্গে মৌজমস্তিতে থাকলে। গল্পগুজবের মধ্যে রেললাইন পার হয়ে সেই বিশাল মাঠে ঢুকে পড়েছি। দুএক জনের সঙ্গে সাইকেলও আছে। তারা কঙ্কালীতলা থেকে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে। তাদের বাড়তি খাটনি। সাইকেল টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছিল কারণ সেটা চড়ে এগিয়ে গেলে গল্প মিস্ করবে।

অল্পক্ষণের মধ্যে দুপুরের চোখ ঝলসানো রোদ মাথার ওপর চেপে বসতে শুরু করেছে। এই ঘটনা যে যুগের তখন টুপি বা ওড়নার ব্যবহার সার্বজনীন ছিল না। সালওয়ার-কামিজের ব্যবহারও ছিলো না বললেই হয়। অতএব মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দিল, ছেলেরা বাঁধল রুমাল। মাঠের এতো বিশাল যে অন্য দিকটা দেখা যায় না মনে পড়ছিল রাজশেখর বসুর ভূশণ্ডির মাঠের কথা। সেই গল্পের মাঠে তবু একটা বেলগাছ ছিল, এখানে কিছুই নেই। খুস্‌খুসুনিটা প্রথমে শুরু হল গলার ভেতর জলের প্রয়োজনে। তার অল্পক্ষণের মধ্যে সেটা ছড়িয়ে পড়ল জিভ, মুখ আর ঠোঁটে। মনে হচ্ছিল যেন মুখের মধ্যে তিতকুটে আটা মেখে বসে আছি। কিন্তু আমরা তখন উপায়হীন। সেই সময় সঙ্গে খাবার জল নিয়ে বেরোনোর চল ছিল না। ছাতিফাটা তেষ্টায় সকলের মেজাজে আস্তে আস্তে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। সেদিন বুঝেছিলাম জল তেষ্টার কষ্ট। তারই মধ্যে উপস্থিত হয়েছে আর এক ভৌতিক সমস্যা। আমরা যত হাঁটছি ধু ধু প্রান্তর যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে, সীমানা যেন আরও দূরে সরে যাচ্ছে। যাদের সঙ্গে সাইকেল ছিল তারা সেগুলো চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভরসা পাচ্ছে না কাঁকুড়ে মাটিতে চাকা পাঙ্কচার হয়ে যাওয়ার ভয়ে। একটা সময় এলো যখন সবাই সবার ওপর মেজাজ হারিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে

লাগল। পরিষ্কার আকাশে দুপুরের চড়া রোদের নিচে কঙ্কালীতলার রাস্তায় শুনশান 'ভূশণ্ডির মাঠ' পেরোতে থাকা জনা পাঁচ-ছয় ছেলেমেয়ের পায়ে চলার আওয়াজ ছাড়া চারদিক অস্বস্তিকরভাবে নিঃশব্দ। যাইহোক, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো।

অবশেষে, বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে হাঁকোর পাঁকোর করে কংকালীতলা পৌঁছেছিলাম। বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে পৌঁছে গেছি। মন্দিরের পাশে কুঁয়োর ঠাণ্ডা জলে আমরা যখন প্রায় অর্ধস্নানে মগ্ন তখন নজরে পড়ল চারপাশের হঠাৎ একটু ঠেলাঠেলি আর হৈচৈ। অবশ্য বাড়াবাড়িরকম কিছু নয়, তবুও একটা ঠেলাঠেলি চলছিল। নজরে পড়ল ঠাকুর দালানের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ধুতির ওপর চেক্ চেক্ গামছা জড়ানো মধ্যবয়সী একজন লোক "শেষ ব্যাচ, শেষ ব্যাচ" করে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছে। ঐ হৈচৈ আর চেঁচামেচির মহেন্দ্রক্ষণে আমরা অনুভব করছিলাম যে কুঁয়োর জলে পিপাসা মিটলেও আমরা প্রত্যেকে অসম্ভব ক্ষুধার্ত। আমরাও সেই মৃদু ধাক্কাধাক্কিতে যোগ দিয়ে 'শেষ ব্যাচের' পঙতিভোজে বসে পড়েছিলাম।বসতে না বসতে সামনে রাখা শালপাতার থালায় পড়লো প্রথমে খিচুড়ি, তারপরে একে একে পাঁচমিশেলি সব্জির ঘ্যাঁট, বেগুনি, কিসের যেন একটা চাটনি, পাঁপড় আর ঘন লাল্‌চে রসে ডোবানো একটি রসগোল্লা। পাশে রাখা মাটির খুড়িতে খাবার জল। আমরা ছাড়া শেষ ব্যচের বাকি লোকজনেরা ছিল চারপাশের গ্রামগুলো থেকে আসা সমাজের সবথেকে দুর্দশাগ্রস্ত লোকজন আর অসংখ্য ভিখারী। অবাক লাগেনি, কারণ সবজায়গাতেই এইসব 'শেষ ব্যাচের' মানুষগুলোর জায়গা এবং সুযোগ, অন্যান্য সবকিছুর মতো সবসময় 'শেষ ব্যাচে'। সেইভাবে দেখতে গেলে, আমরা

কয়েকজন ছেলেমেয়ে কোনকিছুর তোয়াক্কা না করে সেদিন কিন্তু ইংরিজিতে যাকে বলে গেট ক্র্যাশ করে শেষ ব্যাচে বসে পড়েছিলাম। আসলে পেট খালি থাকলে মানুষ তখন আর সামাজিক ভেদাভেদের তোয়াক্কা রাখে না। আমাদেরও তাই হয়েছিল। চেটেপুটে খেয়েছিলাম শেষবেলার রান্নায় সামান্য ধরে যাওয়া খিচুড়ি আর ঘ্যাঁট, সাথে কুঁয়োর অপর্যাপ্ত মিষ্টি জল। এককথায় অমৃত।

২৬/১২/২০১৭

....

ভুবনপুরের গল্পকথা

এদিক ওদিক দু-চার বছরের ভুলভ্রান্তি অগ্রাহ্য করলে, ভুবনপুর গ্রামের সনাতন বাড়ুইয়ের এই পৃথিবীতে প্রায় নব্বই বছর কেটে গেল। বাপ-ঠাকুর্দার মত তারও এই গ্রামেই জন্ম। সনাতন ছিল ভাগচাষি। পনেরো বছর বয়স থেকে এই অঞ্চলের জোতদার সুধাকর মণ্ডলের পঞ্চাশ ষাট বিঘা ধানজমিতে চাষ করতে করতে জীবন কেটেছে। সংসারে স্বচ্ছলতা সেরকম না থাকলেও খাওয়াপড়ার অভাব হয়নি কোনোদিন। অবশ্য সুধাকর মণ্ডলের কখনো কোনোরকমের জোতদারি মনোভাব ছিল না। বংশপরম্পরায় তারা ছিল ভুবনপুররের এক অবস্থাপন্ন, সম্ভ্রান্ত, দরদী এবং অভিভাকীয় কৃষি পরিবার। ফলন যেসব বছর কম হতো, নিজেদের ভাগের ফসল কম নিয়ে বাকিটা সনাতনকে দিয়ে দিত। সনাতনের বৌ, লক্ষ্মী আদ্যোপান্ত সংসার নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। ছেলেমেয়েদের বড় করেছে। সারাবছর ধরে মনিবের বাড়ির জন্য মুড়ি, চিঁড়ে ভেজে দিয়েছে। লক্ষ্মীর তৈরি নাড়ুর এই অঞ্চলে খুব নামডাক। বছরভোর প্রত্যেকটি পূজোপার্বণে ভুবনপুরের প্রায় সব বাড়ি নানারকমের নাড়ু তৈরি করাত লক্ষ্মীকে দিয়ে। প্রতিদিনের এসব কাজের বাইরে, মনিবগিন্নির ডাক পড়লে সেখানে ফাইফরমাস খাটতে তো যেতেই হত। এত কাজের মাঝে কখনো নিজের জন্য একটুআধটু সময় পেলে লক্ষ্মী কাঁথা সেলাই করত, ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই

করত, গুনগুন করে গান গাইত, বাড়ির দেয়ালে মেঝেতে আল্পনা আঁকত। ওদের সন্তানদের মধ্যে বীরেশ্বর ছিল তৃতীয়, আর বীরেশ্বরের আগে-পরে মিলিয়ে তিন মেয়ে।

চাষবাসে বীরেশ্বরের মন কোনোদিন ছিল না। জ্ঞান হয়ে থেকে প্রতিদিন সনাতনকে দেখত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অসুরের মত খাটতে। দুপুরের ভাত বাবা কোনোদিন ওদের সঙ্গে বসে খায়নি। সবসময় মাকে দেখেছে পেতলের দুটো মাঝারি মাপের গামলায় করে বাবার জন্য কাপড়ে বেঁধে ভাত আর একটা ঘটিতে করে এক ঘটি জল নিয়ে মাঠে যেতে। অশ্বথ গাছের ছায়ায় বসে বাবা খাওয়া সারত। শুধু ভারি বর্ষার দিনগুলোতে বাবা বাড়িতে এসে কোনোরকমে দুটি ভাত নাকেমুখে গুঁজে আবার মাঠের দিকে দৌড় দিত। ওদের মেলাতে নিয়ে যাওয়ারও সময় পেত না। সংসারের কাজে মাঝেসাঝে ক্লান্তি বা অবসন্নতা এলে হয়ে লক্ষ্মীর খুব রাগ হত, গজগজ করতে করত আর বলত "লোকটা মাঠের সাথে বিয়া করলেই পারতো! ঘরের দিকে তো নজরই নাই। কি রচনা হচ্ছে সেদিকে খেয়ালই নাই"। বাবার ঐরকম বিরামহীন খাটুনি দেখে ছোট থেকেই বীরেশ্বরের মনে চাষবাসের প্রতি বিরূপতা জন্মায়। বড় হওয়ার সাথে সাথে সেই বিরূপতা এক তীব্র আকার ধারণ করে। এটা নিয়ে সনাতন আর লক্ষ্মীর দুঃখ এবং চিন্তার অন্ত ছিল না। যাইহোক্, খেটে খাওয়ার বয়সে পৌঁছনোর সাথেসাথে, বাবা-মার কথা একরকম অমান্য করে, বীরেশ্বর রোজগারের খোঁজে ভুবনপুর থেকে মাইলদশেক দূরের মাধাইগঞ্জে চলে গিয়েছিল। মাধাইগঞ্জ জেলার একটি বড়সড় গ্রাম, পুরোপুরি না হলেও প্রায় মফস্বল শহর। ধানের আড়ত আছে, বড় বড় তিনটি মুদির দোকান, বড় একটা মিষ্টির দোকান, আরও অনেক রকম জিনিসের দোকানপাট আছে।

ঘুপচি মতন একটা চুল কাটার দোকান আর তার একদম পাশে ছোট একটি পোস্ট অফিস আছে। গ্রামের বাজারে সারাদিনধরে লোকজনের ব্যাস্ততাও প্রচুর। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজনেরা আসত নানারকমের জিনিষপত্রের কেনাবেচা করতে। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে তাদের সঙ্গে বীরেশ্বরের গল্পগুজব হত, আশপাশের পাঁচটা গ্রামের চা মুড়ি খেতে খেতে সবরকম খবরাখবর চালাচালি হত। গ্রামের একটুখানি বাইরে পশ্চিমদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা মাঠ আছে। গ্রামের দিক থেকে দেখা যায় মাঠের ওপারের একটা অশ্বত্থ গাছ, একটা বিশাল নিমগাছ আর দু-তিনটি ছাতিম গাছ। সেই গাছগুলোর ছায়ায় এবং আড়ালে পাঁচ-সাতটি কুঁড়েঘর দেখা যায়। রাতের দিকে দু-চারজনকে মাঠের ভেতর দিয়ে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে যেতে দেখা গেলেও দিনের বেলায় কাউকে সাধারণত দেখা যায় না। লোকজন ওদিকটা এড়িয়ে চললেও মোটামুটি অনেকেই আড়চোখে দেখার চেষ্টা করে। গ্রামের লোকেরা নীচু গলায় বলে ঐ কুঁড়েঘরগুলোতে নাকি রাতসঙ্গিনীরা থাকে। ওদের পুরুষরা আবার চুরি-চামারিতে সিদ্ধহস্ত। গভীর রাতের দিকে অনেকসময় ওদিক থেকে মনকেমনকরা বাঁশির সুর ভেসে আসে।

মাধাইগঞ্জে যাওয়ার পর প্রথমদিকে বীরেশ্বর বেশকিছুদিন অন্যের ঠেলাগাড়ী টানার কাজ শুরু করেছিল। সারাদিন একটা থেকে আরেকটা দোকানে জিনিসপত্র আনা নেওয়া করত। কয়েকমাস পরে হাতে কিছু টাকপয়সা জমিয়ে একটা ঠেলাগাড়ি কিনেছিল। এইভাবে একটা একটা করে বেশ কয়েকটা ঠেলাগাড়ি কিনে সেগুলো ভাড়া খাটাতে আরম্ভ করেছিল। জমানো পয়সা কম পড়ে গেলেও কেনার সুযোগ হাতছাড়া করত না, কিস্তিতে কিনে নিত। এইভাবে দু-আড়াই

বছরের মধ্যে মাধাইগঞ্জের গোটা কুড়ি ঠেলাগাড়ির প্রায় সবগুলোর মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বীরেশ্বরের রোজগারপত্র ভালো হতে শুরু করেছিল।

মানসিকতার দিক থেকে বীরেশ্বর শুধু ঠেলাগাড়ীর ভাড়ায় জীবন কাটিয়ে দেবার লোক ছিল না। বাবার ঐ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনটা ভালোভাবে যাপন করার, জীবনে উন্নতি করার এক অদম্য উচ্চাভিলাষ ওর মধ্যে তৈরি হয়েছিল। সেই উচ্চাভিলাষ সফল করার লক্ষ্যে বীরেশ্বর কোনোরকম আপস করতে রাজি ছিল না। দীর্ঘকালীন স্থিতাবস্থা বীরেশ্বরের পছন্দ হত না। স্থিতাবস্থার ওপর ভরসা রাখতে পারত না। নতুন ব্যাবসায় হাত পাকানোর ইচ্ছে নিয়ে সবাইকে অবাক করে একদিন ঘোড়াসমেত সুলেমানের এক্কাগাড়িটা কিনে নিয়েছিল। টাইফয়েডে ভুগে ভুগে নাজেহাল সুলেমান গাড়িটা যতটুকু চালাতে পারত মাধাইগঞ্জের ভেতরেই চালাত। রোজগারপাতি খুবএকটা হত না। কেনার পরে মাসখানেক গাড়িটা ফেলে রেখে, বীরেশ্বর প্রথমে অপুষ্টিগ্রস্ত ঘোড়াকে খাইয়েদাইয়ে চাঙ্গা করল। তারপর চালাতে শুরু করল মাধাইগঞ্জ আর মাইল ছয়েক দূরের সুধন্যপুর রেলষ্টেশনের মধ্যে। সুধন্যপুরে সারাদিনে চার-পাঁচটা লোকাল ট্রেন দাঁড়ায়। প্রথমদিকে কিছুদিন নিজেই এক্কাগাড়িটা চালালো ব্যবসার ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে। ষ্টেশন যাবার জন্য এক্কাগাড়ী পেয়ে মাধাইগঞ্জের লোকজন মহা খুশি। তাদের জন্য গ্রামের বাইরে যাওয়াআসা করা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বীরেশ্বরের এক্কাগাড়ি সেই কষ্টে সামান্য হলেও কিছুটা সুরাহা দিতে পেরেছিল। কয়েকমাসের মধ্যে বীরেশ্বরের আরেকটি এক্কাগাড়ি হল। এবার অবশ্য কিস্তিতে। তারপর তাড়াহুড়ো না করে বছর দুয়েকের ভেতর বেশ কয়েকটা

এক্কাগাড়ির মালিক হয়ে বসল। গাড়িগুলো মাধাইগঞ্জ থেকে ভুবনপুর সমেত আশেপাশের কয়েকটা গ্রামে নিত্য যাতায়াত শুরু করল। এককথায় বীরেশ্বর বেশ অল্পবয়সে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেল। অল্প বয়সে এই সফলতা অর্জনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল ওর একার। তবে সুলেমানের কথা ও ভোলেনি। সুলেমানকে মাসে মাসে কিছু টাকা দিত। তার বদলে সুলেমান ঠেলা আর এক্কা মিলিয়ে অতগুলো গাড়ির দৈনন্দিন কাজ সামলাতে বীরেশ্বরকে সাহায্য করত।

ইতিমধ্যে সনাতনের মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। দুজনের শ্বশুরবাড়ি আর্থিক দিক থেকে মোটামুটি স্বচ্ছল। তারাও চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। কিছুদিন অন্তর অন্তর ভুবনপুর গিয়ে বাড়ির সব টুকটাক কাজগুলো বীরেশ্বর করে আসে। হাতে সময় থাকলে লক্ষ্মীর গড়ে রাখা নাড়ু, মুড়কি, সরুচালের চিঁড়েভাজা, মাধাইগঞ্জ থেকে কিনে আনা শাড়ী, বাচ্চাদের জামাকাপড় খেলনা এসব নিয়ে বোনেদের সঙ্গে দেখা করে আসে। এককথায় বলতে গেলে, কয়েকবছর আগের জেদের বশে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার প্রভাব বীরেশ্বরদ্র পারিবারিক সম্পর্কের ওপর কোনভাবেই পড়েনি। তবে হ্যাঁ, বাড়ি গেলে লক্ষ্মী কখনোসখনো ছেলে দুরে থাকার চাপা দুঃখটা প্রকাশ করে ফেলত। সনাতন অবশ্য সেসব নিয়ে কিছু বলে না। সে ছেলের সঙ্গে চাষবাস নিয়ে কথা বলে, ভুবনপুরের খবরাখবর দেয়, মাধাইগঞ্জের খবরাখবর নেয়। ছেলের রোজগারপাতির খোঁজখবর নেয়, ভবিষ্যত আলোচনা করে।

সনাতন আর লক্ষ্মী দুজনের বয়স বেড়েছে। আজকাল মাঠের কাজে সনাতনের তাড়াতাড়ি হাঁফ ধরে যায়। তখন ক্ষেতের

এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা আদ্যিকালের পুরনো অশ্বত্থগাছটার ছায়ায় বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়। ভুবনপুরের এই গাছটার বয়সের কোনো কুলকিনারা নেই। জিজ্ঞেস করলে দুশো বছরের কম তো কেউ বলেই না, অনেকে আবার পাঁচশো পার করে দেয়। তবে সরকারি অফিসের আমিন, নাসিরমিঞা বলেন এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটা জমিজমার প্রাচীন দলিলে এই গাছের উল্লেখ আছে। সে যাই হোক না কেন, গাছটি যে অতিপ্রাচীন সে বিষয়ে সবাই একমত। সনাতনকে এখন চাষের কাজে সাহায্য করে যুধিষ্ঠির। ভুবনপুরে ওরা সনাতনদের কয়েক পুরুষের প্রতিবেশী। ওর বাবা আর সনাতন ছিল ছোটবেলার বন্ধু। সনাতনের সবচেয়ে ছোট মেয়েটা যখন দুধের শিশু তখন তাকে কুকুরে কামড়ে দিয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের বাবা জড়িবুটী দিয়ে শিশুটিকে বাঁচিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ঐ কুকুরের কামড়েই যুধিষ্ঠিরের বাবার মৃত্যু হয় জলাতঙ্ক রোগে। তারপর থেকে যুধিষ্ঠিরের অভিভাবকের দায়িত্বটা পালন করে আসছে সনাতন আর লক্ষ্মী দুজনে মিলে। সনাতনদের কাকা-কাকি বলে ডাকে। বীরেশ্বররা ওকে বড়ভাই বলে। সনাতনরা সবাইমিলে মাধাইগঞ্জ গেলে ওদের ভুবনপুরের বাড়ি দেখাশোনা করে যুধিষ্ঠির। একটু হাবাগোবা ভালোমানুষ ধরণের হলেও অত্যন্ত দায়িত্ববান লোক। ওর বৌ সন্ধ্যা কিন্তু ভীষণ হাসিখুশি। সন্ধ্যার সঙ্গে দুদণ্ড কাটালে রোজকার ভাবনাচিন্তা ভুলে গিয়ে খানিকক্ষণ মন খুলে হাসা যায়, মন ভালো হয়ে যায়।

বয়স যে বেড়ে যাচ্ছে সেটা লক্ষ্মীর শরীর ভালোই জানান দিচ্ছে। আজকাল বেশিক্ষণ মাটিতে বসলে কোমরে, পিঠে বেশ ব্যাথা হয়। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে ঝুঁকে হাঁটতে হয়। বাইরের কাজগুলো একেএকে বন্ধ করে দিতে

হচ্ছে। বীরেশ্বর মাধাইগঞ্জ থেকে কি একটা তেল এনে দেয়। সেটা মালিশ করলে রাত্তিরে ঘুমটা মোটামুটি হয়। কিন্তু দিনেরবেলা তো আর তেল মেখে কাজকর্ম করা যায় না। তাই ব্যাথা নিয়েই সেগুলো সারতে হয়। সনাতন আর লক্ষ্মীর খুব ইচ্ছে ছেলের বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে তাকে সংসারী করে নিজেদের ভারমুক্ত করা। বছরখানেক ধরে ছেলের সঙ্গে হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না হতে হতে শেষপর্যন্ত বৈশাখে বীরেশ্বরের বিয়েটা হয়ে গেল। কিছুটা দূরের ফুলঝোড়া গ্রামের কমলা আর পতিত মালাকারের একমাত্র মেয়ে পদ্মরাণী মালাকার এবাড়িতে এলো পদ্মরাণী বাড়ুই হয়ে। শ্বশুরবাড়িতে সবাই ডাকে পদ্ম বলে, শুধু বীরেশ্বর আড়ালে আবডালে ডাকে রাণী বলে। পদ্মর বাবার সব্জি আর ফলের দুটো দোকান মাধাইগঞ্জের হাটে। ভালো বিক্রি। তাছাড়া ফুলঝোড়ার পৈতৃক জমিতে ফুলের চাষ হয়। ফুলঝোড়ার অনেকের ফুলের চাষ আছে। সেই ফুল সন্ধ্যেবেলা তুলে, কঞ্চির ঝুড়িতে প্যাক্ করে, রাত তিনটের ট্রেনে প্রতিদিন বড় শহরে পাঠানো হয়। ফুল নিয়ে নিত্য যেতে যেতে ট্রেনটার নামই হয়ে গেছে 'ফুলের গাড়ি'। ফুলের ব্যবসা দেখে পতিতের বৌ কমলা। ওদের মাঝারি মাপের একটা পুকুরও আছে। ফুলের ব্যবসার আয় থেকে টাকা জমিয়ে পুকুরটা কিনেছিল। বুদ্ধিটা ছিল কমলার। বিয়ে, অন্নপ্রাশন পৈতে, পুজো, পার্বণ এইসব পারিবারিক এবং সামাজিক কাজে কর্মে অর্ডারের মাছ বিক্রি করে ভালো উপার্জন হয়। তাছাড়া কাছাকাছির মফস্বল শহরগুলোতে চুক্তিতে মাছ সাপ্লাই করে বলে সারাবছর মোটামুটি বাঁধা একটা ভালো রোজগার থাকে। বোনের এই শ্বশুর-শাশুড়িকে বীরেশ্বরের খুব পছন্দ।

বাবা-মা যখন পাত্রীর জন্য খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে বীরেশ্বর তখন মাধাইগঞ্জের একটু বাইরে একটুকরো জমি

কিনে তার ওপর ইঁট আর মাটি দিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি তৈরি করেছিল। বাড়ি তৈরির সময় সামনের দিকে একফালি জায়গা খালি রেখে দিয়েছিল - যদি হবু বৌয়ের শাকসব্জির সখ থাকে এই ভেবে। বিয়ের পরে পদ্মকে নিয়ে ও এখন মাধাইগঞ্জে থাকে। কয়েকমাস অন্তর বাবা-মাকে নিজেদের কাছে এনে রাখে। ওদের দুজনেরও ভালো লাগে মাধাইগঞ্জে এসে থাকতে। ছেলে তো ভালোই, বৌমাও নিজেকে খুব সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। বীরেশ্বর সারাদিন নিজের কাজে ব্যাস্ত থাকে। সনাতন বাজারের দিকে মাঝেমধ্যে ঘুরে আসে। পদ্মর সময় কাটে শ্বশুরশাশুড়ির দেখাশোনায়, গল্পগুজবে, সংসারের কাজে আর সামনের সেই একফালি জমিটার পরিচর্যায়। ভুবনপুরের কেউ না কেউ প্রায়দিনই মাধাইগঞ্জে আসে নিজেদের কাজকর্মের ব্যপারে। তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব হয়।

লক্ষ্মীর এক নতুন ভাবনা শুরু হয়েছে। সনাতনকে প্রায় বলে "বোশেখে দু'বছর পার হবে, ঠাকুর এখনো নাতিপুতি দিচ্ছে না। আমরা কবে আছি কবে নাই"। সনাতনের মাথাতেও যে কথাটা আসেনি, তা নয়। তবে সনাতনের বেশি ভাবনা লক্ষ্মীকে নিয়ে, সনাতনের পরে লক্ষ্মী ভুবনপুরে একা থাকতে পারবে কিনা তাই নিয়ে। মাধাইগঞ্জের এতো ভীড়ভাড়, সারাদিনের হৈ-হট্টগোল, সবার ব্যস্ততা - এসবের মধ্যে সনাতন হাঁফিয়ে ওঠে। মাসখানেক যেতে না যেতে ভুবনপুরের আলোবাতাসের জন্য সনাতনের ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। এইরকম একবার ছেলের বাড়িতে থাকার সময় খবর এলো মনিব, সুধাকর মণ্ডল মারা গেছে। সুধাকরের ছেলে খবরটা পাঠিয়েছিল। জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও ঐ পরিবারটি সনাতনদের বরাবর সম্মান দিয়ে এসেছে, কোনদিন মালিকানার ঔদ্ধত্য জাহির করেনি, আচারে

ব্যবহারে বুঝতেও দেয়নি। সুধাকরের কাজেকর্ম চুকে যাবার দিনকয়েক পরে মনিবগিন্নি সনাতন আর লক্ষ্মীকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সকালবেলা গিয়ে দুজনে মনিবগিন্নির সঙ্গে দেখা করে এসেছিল। বিকেলের দিকে লক্ষ্মী উঠোনে চাটাই পেতে শুয়েছিল। কোমরের যন্ত্রণায় আজকাল বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। সনাতন বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পদ্ম আর বীরেশ্বরের কাছে মনিবগিন্নির ডেকে পাঠানোর কারণটা খোলসা করল। সুধাকর মণ্ডল, তার শেষ ইচ্ছাপত্রে অশ্বত্থগাছ লাগোয়া জমিটা, যেটা সনাতন সারাজীবন ধরে ভাগে চাষ করে এসেছে, সনাতনকে দিয়ে গেছে।

ঠিক হল ভালো একটা দিন দেখে জমিপূজো করা হবে। সব কুটুমরা আসবে, মাধাইগঞ্জ থেকে সুলেমান আর কয়েকজনকে বীরেশ্বর আসতে বলবে, পদ্ম আর সন্ধ্যা দুজনেমিলে নারকেল নাড়ু বানিয়ে ভুবনপুরের সব বাড়িতে বিলি করবে। মেয়ে জামাই আত্মীয় কুটুম সবাইকে নেমন্তন্ন করা হবে। অবশেষে নির্দিষ্টদিনে নির্বিঘ্নে পূজো শেষে, শঙ্খধ্বনির সঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের মন্ত্রোচ্চারণ একাকার হয়ে চারিদিক ভরিয়ে দিয়ে, অশ্বত্থগাছের ছত্রছায়ায় থাকা পঞ্চাশ বিঘে জমির আবহমান কালের ভাগচাষী সনাতন বাড়ুই, আজ আশি বছর বয়সে সেই জমিতে পা রাখল, মালিক হয়ে।

কিছুদিন পরে বীরেশ্বর, পদ্ম, লক্ষ্মী আর সনাতন মাধাইগঞ্জ ফিরে গেল। লক্ষ্মীর পক্ষে যাওয়া-আসার এই শারীরিক ধকল নেওয়া খুব মুস্কিল হয়ে পড়েছে। ও এখন আর কোথাও বেরোতে চায় না, পারেও না। ভেঙে যাওয়া শরীরে ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণার ক্লান্তি, বংশধরের মুখ দেখার অন্তহীন অপেক্ষার ক্লান্তি - সব ক্লান্তিতে পরিশ্রান্ত লক্ষ্মী এক বিকেলে মাধাইগঞ্জে

ছেলের বাড়িতে মারা গেল। পরেরদিন দুপুরের দিকে বীরেশ্বর, যুধিষ্ঠিরদের কাঁধে চেপে মনিবগিন্নির সামনে শেষবারের মতো উপস্থিতি দিয়ে লক্ষী দাহ হয়ে গেল ভুবনপুরের খালের ধারে।

কয়েকদিন পরে শ্রাদ্ধশান্তি শেষে বীরেশ্বর আর পদ্ম সনাতনকে নিয়ে মাধাইগঞ্জ ফিরে গেল। ভুবনপুরের জন্য মাঝেমধ্যে সনাতনের মন উসখুস করে, ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেয় পাগল পাগল লাগে। কিন্তু লক্ষ্মী চলে যাবার পর থেকে নিজের ওপর সাহস এবং ভরসা দুটোই পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। তাই মনের কথা মুখে আনে না।

বীরেশ্বর মাধাইগঞ্জের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে অংশীদারিতে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ডজ্ বাস কিনেছে। ততদিনে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড জেলার ভেতরদিকের অনেক রাস্তা বাস এবং ট্রাক চলাচলের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা এবং অনেকক্ষেত্রে কাজও শুরু করে দিয়েছে। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ওদের বাস মাধাইগঞ্জ থেকে যাত্রা করে দশ-বারোটা গ্রাম ঘুরে আবার মাধাইগঞ্জ ফিরে আসে। দিনে তিনটে ট্রিপ করে।

পরের দু-তিন বছরে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সদর হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছিলেন পদ্ম আর বীরেশ্বরের সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই। একমাত্র ভগবানেই ভরসা রাখতে হবে। লক্ষ্মীর অন্তিম ইচ্ছে অনুসারে যুধিষ্ঠির ওদের ভুবনপুরের জমির ভাগচাষী হয়েছে। ইতিমধ্যে সনাতনের নব্বই পার হয়েছে। ভুবনপুর এখন আর ঠিকঠাক ওর মনে আসে না, এলেও আবছা হয়ে ভাঙা ভাঙা টুকরোতে আসে। বীরেশ্বর এখন তিনটে বাসের মালিক হয়েছে। পদ্মর ইচ্ছেয় সে লক্ষ্মীর নামে ভুবনপুরে একটা প্রাইমারি িস্কুল গড়ে দিয়েছে। গ্রামের মানুষ যে যেমন

পেরেছে সময় এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। মনিবগিন্নি জমিটা দান করেছে। প্রয়োজনের তুলনায় নিজের থেকেই বেশি দিয়েছে, যদি কোনদিন হাই ইস্কুল হয় - এই আশা নিয়ে। আপাতত পদ্ম আর সন্ধ্যা দুজনে মিলে ইস্কুলের দেখাশোনা করে। সন্ধ্যা আর যুধিষ্ঠিরের ছেলে সাগর সেই ইস্কুলে পড়াশোনা আরম্ভ করেছে। সুলেমান অনেকদিন হলো কবরে গেছে। কাজের চাপ আর সুলেমানের অভাবে বীরেশ্বর সব ঠেলাগাড়ি বিক্রী করে দিয়েছে। শুধু সনাতনের ইচ্ছেতে প্রথম যে ঠেলাগাড়িটা কিনেছিল, সেটা রেখে দিয়েছে। সনাতন বলেছে ঐ ঠেলাগাড়ি বীরেশ্বরকে জীবনভোর মাটির স্পর্শে রাখবে।

১৭/০৭/২০২৫

****

কর্কশ প্রান্তর

বাবার ছিল বদলির চাকরি। সেই সুবাদে এবং অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এগারো বছরের স্কুলজীবন আমি সর্বমোট সাতটি স্কুলে পড়াশোনা করেছি। বন্ধুরা বলে 'এগারোটা ক্লাস পার করাতে যে এগারোটা স্কুল লাগেনি সেটাই ওর সৌভাগ্য'। শেষ তিনটে বছর কাটিয়েছিলাম এক আবাসিক অর্থাৎ রেসিডেণ্সিয়াল স্কুলে। সিনিয়র সেকশন, মানে ক্লাস এইট থেকে ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রদের জন্য ক্লাস অনুসারে আলাদা আলাদা হোস্টেল। প্রচুর জায়গা নিয়ে তৈরি খোলামেলা ক্যাম্পাসের সবকটা বিল্ডিং ছিল দোতলা। ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস ইলেভেন একই হোস্টেলের দোতলায় আমরা কাটিয়েছি। শেষ দুবছর হোস্টেলের একদম শেষের উইংয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনটে রুমে কেটেছিল। জানলার বাইরে ছিল বেশকিছুটা ন্যাড়া জায়গা আর একটা কুঁয়ো। তারপরে ক্যাম্পাসের পূবদিকের বাউন্ডারি ওয়াল। একে পাথুরে জায়গা, তার ওপর রুক্ষ শুষ্ক আবহাওয়ায় কারণে গরম হতো ভীষণ। অসহ্য গরমের রাতগুলোতে আমরা অনেকে গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম। গ্রীষ্মের সময় জলকষ্ট ছিল ভীষণরকমের। সেটা সামলানোর চেষ্টায় ক্যাম্পাসের ভেতরে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বেশকয়েকটা গভীর কুঁয়ো। কুঁয়োগুলো এত গভীর ছিল যে গরমের সময় ভেতরে জল আছে কি নেই ওপর থেকে দেখা যেত না, বালতি কুঁয়োর নীচে

পৌঁছে পাথরে ঠোকা খেলে তবেই বোঝা যেত। বড়বড় ড্রামে জল ভর্তি করে বাথরুমগুলোতে রাখা থাকত। ড্রামের জল ব্যবহার করা যেত শুধু 'প'য়ের জন্য। স্নানের জায়গা হত কুঁয়োতলা। প্রতি রুমে ইঁট দিয়ে ঘেরা বালির ওপর বসিয়ে রাখা বড় পেটমোটা, মাটির জালায় ভরা থাকত খাবার জল। যেদিন যে কুঁয়োতে জল পাওয়া যেত সেদিন সেই কুঁয়োতে স্নান করতে যেতাম। অনেকদিন এরকম হয়েছে যে চুল কেটে একটা কুঁয়োর জলে গায়েমাথায় সাবান মেখে অন্য কুঁয়োতে গিয়ে চান শেষ করেছি। জলসংকট ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেলে দেখা যেত সাবানের ফেনায় সর্বাঙ্গমোড়া, জাঙ্গিয়া পরা একগাদা পনেরো-ষোল বছরের বেঁটে, মোটা, হাড়গিলে, লম্বা, সুঠাম, রোগা ছেলের দল এক কুঁয়ো থেকে অন্য কুঁয়োতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে শুধু আধবালতি জল গায়ে-মাথায় ঢেলে একটু সভ্য হবার আশায়।

নয়, দশ, এগারো নম্বর খেলার তিনটে মাঠ ছিল পশ্চিমদিকের বাউন্ডারি ওয়াল লাগোয়া। ক্যাম্পাসের একেবারে কেন্দ্রে ছিল জুনিয়র সেকশন এবং সিনিয়র সেকশনের আলাদা আলাদা দুটো স্কুলবিল্ডিং। বিল্ডিংদুটোর সামনের দিকে ছিল এগারোটা খেলার মাঠ আর পিছনের দিকে চারটে হোস্টেল। জুনিয়র স্কুলের পিছনের দিকে ছিল ওদের হোস্টেল। পশ্চিমদিকের বাউন্ডারির ঠিক বাইরে আই.আই.এস. - ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব এঞ্জিনিয়র্স্ কলেজ। সেই কলেজের মাঠে বছরভর থাকত কুমায়ুন রেজিমেন্টের ক্যাম্প। প্রতি বছর মাসখানেকের জন্য রেজিমেন্টের ব্যাণ্ড এসে আমাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে সিলেক্ট করে একেকজনকে একেকটা ইনস্ট্রুমেণ্ট বাজানো শেখাত। আমি কিছুদিন ব্যাগপাইপ শিখেছিলাম। সবটাই ফুসফুসের শক্তি আর দুটো গালের নমনীয়তা, ইংরেজিতে

যাকে বলে ইলাস্টিসিটি, তার খেলা। কিছুদিন শেখার পরে, একদিন দাড়ি কামাতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম আমার ফোলা গাল আরও ফুলে উঠছে। নানারকম অজুহাত দেখিয়ে সঙ্গীতসাধনার ইতি টেনেছিলাম। ক্যাম্পের পরে পশ্চিম দিকে গাছপালাহীন রুক্ষ অসীম মাঠ, যার শেষে দিগন্ত গিয়ে মিশে যায় আকাশের সঙ্গে। আকাশজোড়া পশ্চিমের সেই সীমানায় প্রতিদিন অস্ত যাবার আগে সূর্য তার সূর্যাস্তের আভা নিয়ে হোলি খেলত আকাশের সঙ্গে - লাল, হলুদ আর কমলা রঙ মিশিয়ে। আমি, সুজিত আর হৃষিকেশ, ঐদিকের মাঠগুলোতে খেলা পড়লেই, দশ নম্বর মাঠের বাউন্ডারি ওয়ালের ওপর হাতদুটো আড়াআড়ি রেখে, তার ওপর থুতনি রেখে সূর্যের হোলিখেলা দেখতাম। খেলাশেষে আস্তে আস্তে সূর্যনীচে নেমে গেলে আমরা তিনজন হোস্টেলে ফিরে যেতাম আকাশভরা কল্পনা মাথায় নিয়ে। কথাবার্তা হয়ে উঠত অপ্রয়োজনীয়। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সৌন্দর্য এক নয়, সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। আমার কাছে সূর্যাস্ত চিরদিনই অনেকবেশি নিজস্ব, রঙিন, প্রাণোচ্ছল। সুজিত, হৃষিকেশ দুজনে এখন অস্ত-সূর্যের দেশে। ওরা হয়তো ওখানে রোজ হোলি খেলে।

কন্‌কনে শুকনো হাওয়াতে মোড়া পুরুলিয়ার শীত ততটাই রুক্ষ, ঠিক যতটা তার গ্রীষ্ম। পৌষ-মাঘের রাতে, মোটা লেপের ভেতরে সোয়েটারপরা ক্লান্ত শরীরগুলোতে কনকনে ঠাণ্ডার কাঁপুনিতে ঘুম আসতে চাইত না। রাত যখন আরও অনেক গভীরে চলে যেত, তখন পুবদিকের তেপান্তরের ওপার থেকে মাঝেমধ্যে লেপের ভেতর ভেসে আসত এই-আছে এই-নেই গোছের বৈচিত্র্যশূন্য, সীমানাহীন, ঊর্মীহীন, ক্লান্তিকর এক আওয়াজ। সে আওয়াজ, এক সরলরেখায় চলা রিদ্‌মে ভরসা রেখে পেঁজা তুলোর মত চারিদিকে ভেসে বেড়াত আর তার

ডুটুং টুডুং, ডুটুং টুডুং শব্দ প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ধানের বীজের মত ছড়িয়ে দিত। বহুদুরের গ্রামগুলো থেকে ভেসে আসা মাদল আর মানুষের নৈশ মিলনের আদিম সেই ধ্বনিতে এক নেশা ছিল, সম্মোহনী শক্তি ছিল। শরীর ও মন সেই অবশতার অজগরে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে যেত। শুঁড়িখানার বাইরে রাতভোর পড়ে থাকা মানুষগুলোর মত আমরাও অবশতায় নিমজ্জিত হয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে যেতাম।

শুকনো রুক্ষ এক সন্ধ্যেয়, গ্রীষ্ম না বসন্ত এখন মনে নেই, স্পোর্টসরুমের সামনের খোলা জায়গায় আমরা গিয়ে গোল হয়ে বসেছিলাম। চারপাশের সব আলো নিভিয়ে একটিমাত্র হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। পাশের ছররা গ্রাম থেকে ছৌনাচের একটা দল এসে হ্যাজাকের আলোয় আমাদের ছৌনাচ দেখিয়েছিল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মা দুর্গার চারদিনের জন্য মর্ত্যে আসার নাচ। পাঁচটি বাচ্চা মিলে নাচ করেছিল, সঙ্গতে ছিল দুটি মাদল আর একটা সানাই। খোলা মাঠে বসে, অপ্রতুল আলোআঁধারিতে দেখা পঞ্চান্নবছর আগের সেই জমকালো, উচ্চৈস্বরা, অ্যাক্রোব্যট্ আর মার্শাল আর্ট মেশানো মানভুমের নাচ আমার শরীরে প্রোথিত হয়ে থাকবে আমরণ। তারপর থেকে যেখানে যখন ছৌনাচ দেখি, আমার শরীর ও মন পড়ে থাকে অর্দ্ধশতক আগের হ্যাজাকের আলোয়, মাদলের তালে তালে, মা দুর্গার মর্ত্যে আসার নাচে।

জানলা দিয়ে পুবদিকের সীমানার বাইরে তাকালে চোখে পড়ত এক উন্মক্তু, খাঁখাঁ করা ধু ধু প্রান্তর - প্রাণহীন, সবজুহীন, সময়ের অবহেলায় বন্দী, একদিকটা ঢালু, কঠোর একটা জায়গা। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তির উদ্রেক সৃষ্টি হয়। রুক্ষতার সেই সৌন্দর্য্য ছিল আপসহীনভাবে কর্তৃত্বপরায়ণ।

সেই সৌন্দর্য্য ছিল যাযাবর মেয়েদের মত, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না, আবার সান্নিধ্যেরও সাহস হয় না। সবাই সে সৌন্দর্য্যের মুখোমুখি হতে পারে না। প্রকৃতি শুধু বনজঙ্গল, নদীনালা, পাহাড়পর্বতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। তার ভাঁড়ারে আরও অনেক কিছু আছে যার বেশিরভাগ আমরা কোনোদিন জানব না। তবে আমাদের আজকের গল্পের অসীম প্রান্তরে জোয়ারভাটার মতো দিনে দু'বার প্রাণ আসত। কলকাতা থেকে আগের সন্ধ্যায় ছেড়ে আসা ট্রেন পুরুলিয়া ষ্টেশনে পৌঁছনোর আগে আমাদের প্রান্তরের ঢাল বেয়ে উঠে আসত সকাল সাতটা নাগাদ। সময় নিত সাত মিনিট মত। ইঞ্জিনের কষ্টের আওয়াজে বোঝা যেত তার কষ্টের বহর। ফিরতি ট্রেন রাত দশটায় সেই ঢাল বেয়ে নিঃশব্দে প্রান্তর পার হয়ে যেত, সময় নিত মিনিট পাঁচেক। অন্ধকার রাতে ফিরতি ট্রেনের বগিগুলো দেখা যেত না, শুধুমাত্র সিল্যুয়েট্ দেখা যেত। তবে চলন্ত বগির জানলা দিয়ে উঁকি দেওয়া আলোগুলো দেখলে মনে হত যেন শ'য়ে শ'য়ে জোনাকি পোকা একলাইনে ভেসে চলতে চলতে কোনো অজানাতে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় রেলের চিক্‌মিকি লাইনদুটোকে মনে হতো আকাশ থেকে একজোড়া বিদ্যুতের ঝলক পুরুলিয়ার প্রান্তরে নেমে এসে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করছে, সারাদিনের একাকীত্বের ক্লান্তি দূর করছে।

আমি আগে কখনও পাহাড় দেখিনি। জানলা থেকে বহুদূরে যে আবছা অবয়বের একটা রূপরেখা দেখা যেত, সেটা ছিল তেপান্তরের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা অযোধ্যা পাহাড়। সে নিজের আব্রু দূরত্বের চিক্ দিয়ে আড়ালে রাখত। আমরা তার সম্পূর্ণতা দেখতে পেতাম না, আবছা রূপরেখা থেকে তাকে শুধু কল্পনা করতে পারতাম। বসন্তের শুক্লপক্ষের অনির্দিষ্ট

কিছু রাতে চাঁদের আলো কি রকম যেন অতিমাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সেইসব রাতগুলোর অত্যোজ্জ্বল আলোতে, চিকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অযোধ্যা পাহাড় তার সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দিত সম্পূর্ণ রূপে, পূর্ণ মহিমায়। কিভাবে কি হত জানি না, অনেককে জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাইনি। তবে এটা জানি যে, বাসন্তী শুক্লপক্ষের চাঁদের সেই অনিয়মিত উজ্জ্বলতার দুধসাদা চন্দ্রালোকে, আমি প্রথম পাহাড় দেখেছিলাম আমাদের রুমের জানলায় দাঁড়িয়ে - অযোধ্যা পাহাড়।

১৭/০৭/২০২৫

****

আব্দুলের মা

নভেম্বরের শেষের দিক। পুনে থেকে কলকাতা ফিরছি দুরন্ত এক্সপ্রেসে। ছত্তিশগড়ের প্রত্যন্ত সব ছেঁড়াখোড়া গ্রামগুলোর পাশ দিয়ে সকালের ট্রেন দৌড়োচ্ছে। নজরে পড়ল একটা ঘরের সামনের দাওয়াতে বসে এক বুড়ি সকালের রোদের তাপ নিচ্ছে। পরনে জড়ানো বহুদিনের পুরোনো, রং মুছে যাওয়া একটা শাড়ি আর মাথাভর্তি শনের নুড়ির মতো বাদামি রঙের চুল। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলা রেলগাড়ির জানলার ভেতর থেকে ঐটুকুই দেখতে পেলাম। বুড়ির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলো ওকে যেন একটু আব্দুলের মায়ের মতন দেখতে।

আব্দুলের মা আর শোলুর মা আমাদের মামার বাড়ির ধান-কূটনী ছিল। বয়েসে শোলুর মা একটু বড়। যতদূর মনে পড়ে ও ছিল আব্দুলের মায়ের খালা, অর্থাৎ মাসি। চেহারাতে আব্দুলের মা ছিল শক্তপোক্ত ধরনের, গায়ের রঙ ছিল পোড়া বাদামি। সেই তুলনায় শোলুর মা ছিল অনেকটা ফর্সা, কিন্তু শরীর হয়তো একটু রোগা, দুর্বল। সারাজীবন ধরে উদয়াস্ত রোদে-জলে, মাঠেঘাটে খেটে খাওয়া পোড়া চামড়ার শরীরগুলো ঢাকা থাকতো গাঢ় সবুজ রঙের মোটা কাপড়ের সরু নীল-পাড় শাড়িতে। গায়ে থাকত গাঢ় নীলরঙের ছেলেদের বুশশার্টের মতন কোমর ঢাকা, কনুইয়ের নীচ পর্যন্ত ঢোল-হাতা, গলা-বন্ধ জামা। জামার সামনের দুদিকে পেটের কাছে দুটো বড় বড় পকেট। পকেটগুলোতে ওরা রাখত বিড়ি,

দেশলাই, দোক্তা, চুন, খুচরো পয়সা এইসব টুকিটাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। অন্য কোনো রঙের জামা বা শাড়িতে ওদের কখনও দেখিনি।

শীতের মুখে জমির ধান ওঠার পরে আমাদের বাড়ি থেকে দুজনমিলে রোজ এক বস্তা করে দুবস্তা ধান মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যেত। কয়েকদিন পরে সেই ধান ভেঙে চাল করে নিয়ে আসত। ওরা আসত সারাবছর। ধান ভাঙার সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে আরও নানারকম রোজকার খুচখাচ্ কাজ করে দিত। কয়লা ভেঙ্গে দেওয়া, উনুনে মাটি লেপে দেওয়া, পুকুরের ঘাট ভালো করে পরিষ্কার করে দেওয়া, উঠোন থেকে শ্যাওলা তুলে দেওয়া, টুকিটাকি শুকনো বাজার করে দেওয়া, স্নানের জলের বড় বড় লোহার বালতি তিনচারদিন অন্তর মেজে দেওয়া - এইধরনের সব পাঁচমেশালি গৃহস্থালি কাজ। এর বাইরেও আরও অনেককিছু করে দিত। খুব ছোটতে আমাদের জ্বরজ্বালা কমতে না চাইলে আব্দুলের মা আমাদের কোলে নিয়ে পাশের মসজিদের ঠিক বাইরে দুপুরের নামাজের সময় দাঁড়াত। নামাজ শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মুসল্লিদের অনেকে আমাদের মাথায় ফুঁ দিয়ে যেত। সবশেষে ইমামসাহেব এসে দুটো কানের ওপর দুহাত দিয়ে আমাদের মাথা শক্ত করে চেপে ধরে জোরে জোরে তিনবার কপালে আর মাথায় ফুঁ দিতেন। আব্দুলের মা আমাদের নিয়ে বাড়ি ফিরে আসত। দিনদুয়েকের মধ্যে আমরা ঠিক হয়ে যেতাম। খুশি হয়ে মালকিন ওদের দুজনকে দুটাকা করে চারটাকা বকশিশ দিত।

এসবের বাইরে, ওদের দুজনেরই - বিশেষ করে শোলুর মায়ের - প্রয়োজনীতা বেড়ে যেত যখন বাড়িতে অথবা চেনা পরিচিতদের মধ্যে কোনো মহিলা সন্তানসম্ভবা হত। একমুঠো

বালি, চালের একটা পোকা অথবা নিদেনপক্ষে মাথার একটা উকুন আর নিজেদের ভেতর কিছু ফিসফাস্ করে ওরা মোটামুটি সঠিক বলে দিতে পারত যে ছেলে হবে কি মেয়ে। শর্ত একটাই - পোকাগুলো জ্যান্ত হওয়া চাই। পুরো টেকনিকটা আমি জানি, কিন্তু সেটা এই কাহিনীতে অপ্রয়োজনীয়। তবে আমার দেখা ওদের প্রায় প্রতিটি ভবিষ্যতবাণী কিন্ত সত্যি হতে দেখেছি। যে দুচারটে মিলত না, সেগুলোর দোষ ছিল পোকার।

আব্দুলের মা আর আমার মা প্রায় সমবয়সী ছিল। সেই কারণে আমার মনে হয় ওদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বন্ধুত্ব ছিল। বয়স কম হলেও আমি সেই প্রচ্ছন্নতার আড়ালে থাকা সম্পর্কটা আন্দাজ করতে পারতাম। বন্ধুত্বের ইঙ্গিত যে খুব একটা পাওয়া যেত তা নয়, তবে একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারা যেত। মা হয়তো জিজ্ঞেস করল "কাল কি রান্না করেছিলি" অথবা "আব্দুল এত রোগা হয়েছে কেন রে' - এইসব। আবার বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে আব্দুলের মাকেও বলতে শুনেছি "খোঁকির কাছে একবার ঘুরে এসো। এতটুকুন তো মেয়ে তো, খোঁকির ভালো লাগবে। মা-বাবার সব দেখভাল্ আমরা করে নেব"। আমাদের ভাইবোনদের ওরা খোঁকা আর খোঁকি বলে ডাকত। সম্পর্কটা প্রচ্ছন্ন বলছি এই কারণে যে সেইসব দিনগুলোর দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় যেকোনো কারণেই হোক, ওরা দুজনেই হয়তো সচেতনভাবে সেই সম্পর্কটা কখনও প্রকট হতে দিত না। হতে পারে সামজিক সংস্কার সেটা এখন জানারও উপায় নেই, বোঝারও উপায় নেই।

আব্দুলকে আমি কয়েকবার দেখেছি। আমার কাছাকাছি বয়সের ছেলে, অমাবস্যার মতন গায়ের রঙ, ভাস্কর্যের মতো

পেশিবহুল চেহারা, শরীর বেয়ে চুঁয়ে পড়া আদিম এক মাদকতা আর ঠোঁটে সবসময়ের লেগে থাকা এক দুগ্ধপোষ্যের হাসি। আব্দুল আসত বা ওকে ডাকা হত যখন বাড়ীতে কোনো ভারী কাজ থাকত। যেমন গোয়ালে চালের খড় পাল্টাতে হবে, দোতলার ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়া আটকাতে আলকাতরা লেপ্টে দিতে হবে, হনুমানের উৎপাত কমাতে নিম গাছের ডাল কাটতে হবে, পুকুরপাড়ের আবর্জনা পরিস্কার করতে হবে, এই ধরনের সব কাজ।

এই ভাবে চলতে চলতে একটা সময় এল যখন আমরা ভাইবোনেরা নিজেদের জীবনের অঙ্ক কষতে নিজের নিজের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যোগযোগগুলো কদাচিত ছুটিছাটা আর বেশিরভাগটাই পোস্টকার্ড অথবা ইনল্যান্ড লেটারের মধ্যে আটকে পড়ল। মায়ের চিঠিতে একদিন জানলাম শোলুর মা মাটির নীচে শয্যা নিয়েছে। আব্দুলের মায়েরও শরীর ভাঙতে শুরু করেছে। তবুও রোজ আসে। তবে বয়েসের জন্যে এখন আর অত কাজ করে উঠতে পারে না, অল্পেই থকে যায়। এবার ধান ভাঙ্গাতে খুব অসুবিধা হয়েছে। এখন বেশিরভাগ সময় আব্দুল এসে ধান নিয়ে যায়। পরের এক বা দুবছরের মধ্যে কোনো একটা বছরে পূজোর সময় সবাই, মানে আমরা মামাতো মাসতুতো সব ভাইবোনেরা একসাথে হয়েছিলাম আমাদের মামাবাড়িতে। ঐ চার-পাঁচ দিন বাড়িটা বাড়ি ছিল নাকি শীতের হাট ছিল, বলা দুষ্কর। আব্দুলকে নিয়ে আব্দুলের মা একদিন এসেছিল দেখা করতে। খোঁকা-খোঁকীদের জন্যে ঢেকিতে ছাঁটা চিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। চেহারায় বয়েসের চেয়ে অনেক বেশি বুড়ি হয়ে গেছে তখন। খুব আস্তে আস্তে হাঁটে। বস্তাভর্তি ধান আর মাথায় তুলতে পারে না। চলে যাবার সময় ছোট্ট একটা পোঁটলায় ধান বেঁধে মাথায় করে নিয়ে গেল। ঐটুকু ধান নিয়ে গিয়ে কি করবে

জানতে চাওয়ায় মালকিন বলেছিলেন "এটা ওর আত্মসম্মান। এই বোধটুকুর জন্যই ও বেঁচে আছে"। আব্দুলের মায়ের সেদিনের সেই আত্মসন্মান ধরে রাখার অদম্য প্রচেষ্টা দেখতে দেখতে জানি না কেনো নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হয়েছিল। আব্দুলের মাকে সেই আমার শেষ দেখা।

ছুটি কাটিয়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে যাওয়ার কয়েক মাস পরে মায়ের চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম দুদিনের কি একটা অসুখে আব্দুল হঠাৎ মারা গেছে। চাঁদপুরের পীরবাবা আর ধুলিয়ানের ওঝারা সবাইমিলে ওকে আটকাতে পারেনি। আব্দুলের মা নিজেই নাকি এক নিঃঝুম দুপুরে আব্দুলের খবরটা আমাদের বাড়ী বয়ে দিতে এসেছিল। খবরটা দিয়ে আর দাঁড়ায়নি, সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

এরপর বহু কাল কেটে গেছে। সেই দুপুরের পরে আব্দুলের মাকে আমরা বা আমাদের শহরের কেউ আর কখনও বা কোথাও দেখিনি। বহু চেষ্টা করেও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। মাঝেমধ্যে বড় জানতে ইচ্ছে করে আব্দুলের মা শেষকালটায় কোথায় ছিল, কেমন ছিল। এগুলোর চেয়েও বেশি জানতে ইচ্ছে করে নিজস্ব আত্মসম্মানটুকু শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে ও চলে যেতে পেরেছিল কি না।

কোনোদিন কারণে, অকারণে আব্দুলের মায়ের কথা মনে পড়লে বড্ড অস্বস্তি হয়। যেমন আজ সকালে ছত্তিশগড়ের নাম না জানা সেই গ্রামের দাওয়ায় বসে থাকা বুড়িকে দেখে মনে পড়ল।

২২/১১/২০১৫

*****

স্বীকারোক্তি

সেদিন সকালে বাজারে গেছি রোজকার মতো টুকটাক কিছু জিনিসপত্র কিনতে। বাজারে গিয়ে ভাবলাম এসেছি যখন সব্জির বাজারটাও একবার ঘুরে যাই। আসলে সব্জির বাজারে ঘুরে ঘুরে টাটকা তাজা সব্জি দেখে বেড়াতে, কেনাকাটা করতে আমার খুব ভালো লাগে। বিশেষকরে সময়টা যদি শীতকাল হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা! দরদাম করি না বলে সব্জিঅলারাও আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে। অনেকসময় কোনো কিছু কেনাকাটা করার না থাকলেও আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় এইরকম একটা বাজারে কাটিয়ে দিতে পারি। আজ সেইভাবেই ঘোরাঘুরি করছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ল ছেলেটা। সব্জি কিনছিল। ছেলেটাকে আগে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। তবে দেখামাত্র বুকের ভেতর আলতো একটা ধাক্কা লাগল। মনে হল ছেলেটি আমার বহুযুগ আগের খুব পরিচিত কেউ। কিন্তু কোথায়, কবে, কেমন করে, কিভাবে পরিচয়, সেসব কিছুই মনে করতে পারলাম না। কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি এরকম এক অনুভূতিতে নিমেষের মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়লাম। সারাটা দিন বুকের মধ্যে একটা অবুঝ অস্বস্তি চেপে বসে থাকল। ঠিক সেইরকম কটা কটা চোখ, সজারুর কাঁটার মতো হাল্কা বাদামি রঙের খোঁচাখোঁচা চুল, সারাক্ষণের লেগে থাকা হুবহু সেই হকচকিত শারীরিক অভিব্যক্তি, এই সবকিছুই তো আমার

অনন্তকালের চেনা। কিন্তু সেদিন সেই মূহুর্তে ভরা বাজারের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে আমার ধোঁয়াটে স্মৃতিতে আমি কিছুতেই মুখ বসাতে পারলাম না, পরের কয়েকটা দিনও পারিনি। কয়েকটা দিন কেটেছিল অদ্ভুতরকম মনকেমন করা একটা চিনচিনে অস্বস্তিতে ডুবে থেকে।

জ্ঞান হবার পর থেকে আমরা দেখে এসেছি আমাদের বাড়িতে সবসময় চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোক রাখা হত। এরা ছিল সব অল্পবয়সি ছেলে এবং নিয়ম করে পাল্টে যেত বাবার চাকরিসূত্রে আমরা যখন অন্য শহরে বদলি হয়ে যেতাম।

আমি তখন ক্লাস ফাইভ বা সিক্সে পড়ি। সেই সময় আমাদের দুর্গাপুরের বাড়ীতে এইরকম একজনকে রাখা হয়েছিল। বয়স ছিল বড় জোর পনেরো কি ষোল। হাট্টা-কাট্টা ফর্সা চেহারা, কটা কটা চোখ, আর মাথা ভর্তি হাল্কা বাদামি রঙের চুল। চুলগুলো ছিল অনেকটা সজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া, বেশ নরম। সবসময় সামান্য হকচকিয়ে থাকা একটা চাউনি। আর উপস্থিতি, কথাবার্তা সবকিছুতেই একটু জেদের ছোঁয়া। বাঁকুড়া জেলার কোনো এক অজ পাড়াগাঁয়ে গ্রামে ওর দেশ ছিল। গ্রামটার নাম আমাদের বলেছিল। তবে বহুবছর হয়ে গেল সেটা আর মনে নেই।

সুবোধ ছিলো ভীষণ রকম ঘুমকাতুরে। পারলে বোধহয় হাঁটতে হাঁটতে ঘুমোতে পারত। ওর ঘুমানোর জায়গা ছিল বাবার অফিসঘরে। সেই ঘরের ফাইলের আলমারির পেছনে একটা চটের থলিতে থাকত ওর জামাকাপড়, অন্যান্য জিনিসপত্র। অফিস ছিলো তিনতলায়। আমরা থাকতাম ঠিক ওপরে চারতলায়। আমার কাজ ছিল প্রতিদিন সকালে সুবোধকে ঘুম থেকে ওঠানোর। কদাচিৎ কখনো ওঠাতে পারতাম।

বেশিরভাগ দিন বাবাকেই ঐ কাজটা করতে হত। সুবোধের রোজকার দিন দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার জন্য বকুনি খেয়ে শুরু হত।

কাছাকাছি বয়েসের বলে আমার আর সুবোধের মধ্যে একটা বন্ধু-বন্ধু ব্যাপার ছিল। একসাথে লুডো, ক্যারম এসব খেলতাম। মাঝেমধ্যে যেদিন আমাদের দুজনকে একসাথে বাজার থেকে কিছু আনতে পাঠানো হতো, নিজেদের তখন পৃথিবীর মালিক মনে হতো। সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসার মত বিকেলবেলা মাঠে খেলতে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। আমি যখন সামনের মাঠে খেলতে যেতাম আমার বন্ধুদের সাথে, সুবোধ তখন বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকত। খেলতে খেলতে অনেকদিন দেখেছি সুবোধ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে, রেলিংএর ওপর রাখা দুই হাতের ওপর থুতনিটা রেখে নিবিষ্টমনে আমাদের খেলা দেখছে। সন্ধ্যেবেলা যখন আমরা পড়তে বসতাম তখন একটু দূরে বসে থাকত, আমাদের বইপত্রের পাতাগুলো নিজের মনে উল্টেপাল্টে দেখত। তবে ঐসময়টাতে আমাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করত না, বিরক্ত করত না। বাড়িতে নেওয়া হত যুগান্তর পত্রিকা। এখন মনে পড়ছে ঐরকম এক সন্ধ্যেয় দেখলাম যুগান্তর কাগজের শেষ পাতায় পেন্সিল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কিসব কাটাকুটি করে চলেছে। অনেক্ষণ পরে দেখিয়েচ

ছিল 'সুবোধ' শব্দটা লিখেছে। আমার ঐ বয়সের ধারণায় চাকরবাকররা লেখাপড়া জানে না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম ‘তুই লিখতে জানিস’? উত্তর দেয়নি। শুধু আমার চোখে চোখ রেখে একটুখানি মুচকি হেসেছিলো। সেই হাসির

কি মানে তখন বুঝিনি। যখন বুঝলাম ততদিনে সুবোধ আমার ত্রিসীমানার বাইরে চলে গেছে।

একটা জিনিসের ওপর আমাদের দুজনেরই নেকনজর চিল। সেটা হচ্ছে অ্যালার্ম ঘড়ি। অ্যালার্ম কী করে বাজে, কেন বাজে, সবসময় একই রকম আওয়াজ কেন বেরোয়, এইসব কৌতুহল আর কি! আসলে ঐ একটা বয়স যখন প্রায় সব ছেলেদের বোধহয় যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যপারে একটু-আধটু কৌতূহল থাকে। যাইহোক, অ্যালার্মের রহস্যটা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে রহস্যই থেকে গিয়েছিল, রহস্যভেদ করে ওঠা যায়নি।

যে সময়ের বা যে যুগের স্মৃতিচারণ এটা, সেই যুগে বেশিরভাগ সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়িতে আজকের দিনের রেফ্রিজারেটর বা ফ্রীজ ছিল অনেকটাই অধরা। আমাদের বাড়িতেও তাই। ফ্রীজের পূর্বসুরী হিসেবে যে জিনিসটা প্রত্যেক বাড়িতে থাকত তার নাম ছিল মিট্‌সেফ। একটা মাঝারি সাইজের দুই কি বড়জোর তিন তাকের কাঠের আলমারি। তার চারপাশটা কাঠের বদলে সরু তারের জাল দিয়ে ঘেরা। ঋতু বিশেষে খাবারদাবার মিটসেফের ভেতরে বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টা ভালোই থেকে যেত। সেরকম একটা মিটসেফ্ আমাদের বাড়িতেও ছিল এবং তাতে খাবার রাখা হতো। মিটসেফের চারটে পায়া চারটে জলভর্তি চিনেমাটির বাটির ওপর বসানো থাকত রঙবেরঙের পিঁপড়েদের সবকিছু চেখে দেখার অভ্যাসে থেকে বিরত রাখতে।

একদিন বিকেলবেলা ঘটনাচক্রে বাড়িতে আমি একা ছিলাম। মিটসেফে রাখা মিষ্টির ভাঁড় থেকে একটা রসগোল্লা তুলে খেয়ে নিয়েছিলাম। খাওয়ার পরে সেটা কাউকে বলিনি, ইচ্ছে করেই

বলিনি। ভয়টা ছিল বকুনি খাবার, না জিজ্ঞেস করে লুকিয়ে খাওয়ার। কাজটা যে ঠিক হয় নি সেটা বুঝেছিলাম। সব বাড়ির মতো আমাদের বাড়িতেও লুকিয়ে খাওয়াটা ভীষণরকমের একটা অন্যায় কাজ বলে ধরা হতো এবং সেভাবেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তবুও অন্যায় জেনেও কেন যে সেটা করেছিলাম আমি জানি না। মোদ্দা কথা হলো কাজটা আমি করেছিলাম। পরেরদিন সকালবেলা জলখাবার দেবার সময় মায়ের নজরে পড়ল ঘটনাটি। মা, বাবা দুজনই খুব রেগে গিয়েছিলেন না বলে খাবার জন্য। আমাকে 'খেয়েছি' কিনা জিজ্ঞেস করা হলে দ্বিধাহীন ভাবে 'না' বলেছিলাম। এরপর ছিল সুবোধের পালা। সুবোধ দাঁড়িয়ে ছিল তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে - হাত দুটো পেছন দিকে করে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, ঘটনার আকস্মিকতায় ভীষণরকম হতচকিত এবং ঘাবড়ে যাওয়া একটা মুখ নিয়ে। ওকে জিজ্ঞেস করতে ও স্বাভাবিক ভাবেই 'না' বলল। কিন্তু ঐরকম টানটান পরিস্থিতিতে কে ওর কথা শোনে! বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রচন্ড বকাবকির পর সবশেষে সুবোধকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে দ্বিতীয়বার ও যদি এরকম করে তাহলে সেই মুহূর্তে পত্রপাঠ বিদেয় করে দেওয়া হবে। তার ঠিক পরের দৃশ্যটি আজও আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসে। সময়ের অদমনীয় আপসহীনতা আজ পর্য্যন্ত সেই ছবিকে আবছা করে দিতে পারেনি। দুহাতের দুই মুঠিতে জানলার দুটো রড শক্ত করে ধরে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে পাথরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সুবোধ। পলকহীন, হতবাক সেই শূন্য দৃষ্টি থেকে চোখের জল নিঃশব্দে, অঝোরে পড়ে চলেছে, গভীর থেকে গভীরতর আঘাত সৃষ্ট এক শব্দহীন কান্না। ক্ষমাহীন সেই অন্যায়ের উপলব্ধিতা সত্ত্বেও সেই মুহূর্তে আমার যে খারাপ লাগেনি

অথবা নিজের প্রতি নিজের যে কোনো লজ্জা হয়নি তা নয়। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, সত্যি কবুল করার সাহস সেদিন সেই পরিস্থিতিতে আমি জোগাড় করে উঠতে পারিনি। তারপরেও আর কোনোদিন সেদিনের সত্য ঘটনা কাউকে বলে উঠতে পারিনি। আপসহীনভাবে বয়স যত বেড়ে চলেছে, অর্দ্ধ শতাব্দীর চেয়েও বেশি পুরনো সেই একান্ত গভীর অন্যায়বোধ আমাকে তত বেশি করে বিহ্বলতার অতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা রেখে সেদিন যাঁরা সুবোধকে দোষী ঠাউরে ছিলেন, তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ভুল স্বীকার করার সুযোগ আর নেই। তবে সুবোধের সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা তাগিদ সর্বক্ষণ আমাকে তাড়া করে বেড়ায়, আর কিছু না - শুধু একবার ওর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়াবার একটা সুযোগের জন্য।

২৯/১১/২০১৮

******

সাড়েপাঁচ ঘন্টার গল্প

স্কুলজীবনের শেষ সাড়ে তিনবছর আমার কেটেছিল পুরুলিয়ার এক হোষ্টেলে। আর পাঁচটা স্কুলের মত সেখানেও ছুটি হত বছরে তিনবার। গরমের ছুটি, পূজোর ছুটি আর শীতের ছুটি। প্রত্যেক ছুটির শেষে বাড়ি থেকে হোষ্টেল ফিরে যাবার ব্যাপারটা ছিল মোটামুটি এক মহোৎসব। কাকভোরের ট্রেণে রওনা হয়ে সন্ধ্যের মুখে ধানবাদ পৌঁছতাম। সেখানে রাত্রিবাস। পরদিন সকালে সেখান থেকে বাস ধরে শেষদুপুরে হোষ্টেল পৌঁছতাম। অন্যভাবে গেলে সেই একই সময়ের ট্রেণ ধরে বোলপুরে পৌঁছে, ওখান থেকে বাস ধরে দুর্গাপুর পৌঁছনো। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বাস ধরে সেই শেষদুপুরে হোষ্টেল পৌঁছনো। অর্থাৎ যেকোনো দিক দিয়ে পুরো দুদিনের জার্নি। সেই তুলনায় হোষ্টেল থেকে বাড়ি পৌঁছতে বাস আর ট্রেন মিলিয়ে লাগত মাত্র ঘণ্টাবারো। বাসে করে বর্দ্ধমান, সেখান থেকে ট্রেন ধরে বাড়ি। এই জার্নিটা আমার বেশ ভালো লাগত, কারণ অল্প সময়ের সেই জার্নি ছিল বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ।

আমাদের স্কুল ছিল পুরুলিয়া শহরের মাইল তিনেক বাইরে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া রাস্তার ওপর। কাছেই ছিল বোঙ্গাবাড়ি গ্রাম। জেলার বেশিরভাগ দরিদ্র গ্রামগুলোর তুলনায় এই গ্রামটি বোধহয় একটু বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। এদিকের গ্রামগুলোর নাম বেশ মজার, এখনও কানে বাজে। বোঙ্গাবাড়ি, ছররা, হেঁটলা,

দলদলি, হুড়া, বাঘমুণ্ডি, হেটগুগুই ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরুলিয়া বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে সকাল ছটায় রওনা দিয়ে ঘড়ি ধরে ঠিক সকাল সোয়া ছটায় আমাদের স্কুলগেটের সামনে লালরঙের বাসটা এসে দাঁড়াত। লম্বা রুটের এক্সপ্রেস বাস। আজ থেকে পাঁচ দশক আগে এক্সপ্রেস বাসের সম্মান ছিল অনেক বেশি, অতএব ভাড়াও বেশি। তাই বসার জায়গা খুব একটা খালি না থাকলেও ভীড়ে ঠাসাঠাসি নহত না। রঙের জন্য সবার কাছে বাসটার পরিচিতি ছিল লালবাস নামে। বাসের গন্তব্য হুড়া, কাশীপুর মোড়, ঝাঁটিপাহাড়ি, কয়েকটা নাম ভুলে যাওয়া স্টপেজ, বাঁকুড়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান হয়ে কলকাতা। ঠিক পৌনে বারোটা নাগাদ বর্ধমান ষ্টেশনের সামনে বাস আমাকে নামিয়ে দিত। সেখান থেকে বাড়ি যাবার ট্রেন ধরে আরেকটা ঘণ্টা চারেকের যাত্রা। বাস আর ট্রেনের সময়ের মাঝে ষ্টেশনে আড়াই ঘণ্টার একটা সাময়িক যাত্রাবিরতি। এখনকার বিমানযাত্রার ভাষায় বলে লে-ওভার। রেলওয়ে ক্যাটারিংয়ে রুটি মাংসের সঙ্গে এক বোতল কোকা-কোলা খেয়ে দোতলার ওয়েটিং রুমের ইঝিচেয়ারে কিছুক্ষণের জন্য গা এলিয়ে নিতাম।

হোষ্টেল থেকে একমাত্র আমি উঠতাম স্কুলের সামনের ষ্টপেজ থেকে লাল বাসে। প্রতিবেশী বোঙ্গাবাড়ি গ্রামের স্টপেজ থেকে প্রত্যেকবার দুএকটা পরিবার উঠত তাদের কাচ্চাবাচ্চা সমেত। যেটা আমার নজর কাড়ত সেটা হচ্ছে ওরা যখনই উঠত পরিবারপিছু অন্তত দুটো করে ছাগল এদের সঙ্গে থাকতই থাকত। আমার মত ঐ অঞ্চলের সঙ্গে অনভ্যস্ত মানুষদের কাছে ব্যাপারটা অস্বস্তিকর হলেও ছাগলগুলো বাসের ভেতর কারোর কোন অসুবিধা করত না, সিটের তলায় চুপচাপ পা মুড়ে বসে থাকত। শুধু মাঝেসাঝে নাক দিয়ে জুতোতে হাল্কা

ঠেলা দিত, হয়তো একটু বেশি জায়গা চাইত। বোঙ্গাবাড়ির পরিবারেরা সাধারণত পরের ষ্টপেজ ঝাঁটিপাহাড়িতে নেমে যেত। আমার ধারণা ছাগলগুলো সেখানে বিক্রীর জন্য নিয়ে যেত। আমার সঙ্গে লটবহর হিসেবে থাকত স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী কুচকুচে কালো রঙের মিলিটারি ট্রাঙ্ক, যার সামনের ডানদিকে ধবধবে সাদা রঙ দিয়ে বড়বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা থাকত আমার নাম, ক্লাস আর স্কুলের নাম। স্কুলের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে আমার পরনে থাকত স্কুল ইউনিফর্ম। ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় ইউনিফর্ম পরে যাওয়াটা নিয়ম ছিল। অর্থাৎ মাঝরাস্তা থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হলেও সব রাস্তা বন্ধ! অবশ্য ছুটির পরে বাড়ি থেকে হোষ্টেলে ফেরার সময় এই নিয়ম প্রযোজ্য হত না। বাস মোটামুটি ভর্তি থাকলেও বসার একটা না একটা জায়গা পেয়েই যেতাম। জায়গা না পেলে দূরের যাত্রী বলে কণ্ডাক্টার কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিত। দুর্গাপুর পর্যন্ত পুরোটাই ছিল সিঙ্গল রাস্তা। তারমধ্যে বাঁকুড়া পর্যন্ত ধুলোয় ভরা। ঐপর্যন্ত কাঁচা রাস্তা আর পিচের রাস্তার মধ্যে ছিল ভীষণরকম গা ঠেলাঠেলি, অধিকার দখলের লড়াই! ঝাঁটিপাহাড়ি আসতে আসতে পিচের রাস্তায় পিচ খুঁজে পাওয়া যেত না। বাসের ভেতর, বাইরে মিলিয়ে সর্বত্র ধুলোর কুয়াশায় মোড়া। সেই ধুলোর আস্তরণ হতো অনেকটা পাহাড়ি মেঘের মতো, অস্বস্তি যতই হোক না কেন তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকতেই হবে। ঝাঁটিপাহাড়িতে বাস দাঁড়াত মিনিটখানেকের জন্য। কণ্ডাকটার 'বাঁকুড়া বাঁকুড়া' বলে হাজার চেঁচালেও ওখান থেকে কাউকে কোনোদিন বাসে উঠতে দেখিনি। কারণ ছিল বোধহয় বাসের কৌলিন্য। একে এক্সপ্রেস বাস, তাতে আবার ভাড়া অনেকটা বেশি। পরের ষ্টপেজ বাঁকুড়ায় আটটা সোয়াআটটা নাগাদ লালবাস পৌঁছত। শহরের একেবারে

মাঝখানে বাসষ্ট্যাণ্ড। ধুলোর আস্তরণ সেরকম ঘন না হলেও জামায় ফুঁ দিলে ধুলো কিন্তু উড়ত। সকালবেলার ব্যাস্ত বাসষ্ট্যাণ্ডে গিজগিজ করত অসংখ্য মানুষ, অগুন্তি খাবারের দোকান, মৌমাছি, প্রচুর ধুলো আর ততোধিক মাছি। ফিরিঅলারা ঝাঁকা মাথায় বাসের জানলাগুলোর পাশেপাশে ঘুরেঘুরে চপ্, সিঙ্গারা, বেসনের লাড্ডু, চিনেবাদাম, ভাবরা ভাজা, পেয়ারা, কলা, আঙ্গুর, খেজুর এসব বিক্রী করত। বেসন আর সোডা দিয়ে তৈরী জিলিপি আকৃতির ভাজা নোনতার পরিচিতি ভাবরা ভাজা নামে। মানভুমের লোকদের এটি খুব পছন্দের খাবার। কোনো এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত কস্তার লাড্ডুর কথা। নামটা বললেও বিস্তারিতভাবে সে কিছু বলতে পারেনি। বাসের জানলা দিয়ে একবার এক ফিরিঅলাকে কস্তার লাড্ডুর কথা জিজ্ঞেস করে মনে হল লোকটি বোধহয় একটু লজ্জা পেয়েছে। লাড্ডুর কথা ও শোনে নি বোঝাই গেল। ফিরিঅলাকে করা আমার প্রশ্নটি শুনতে পেয়েছিলেন পাশে বসা এক বৃদ্ধ সহযাত্রী। তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম মানভুমের একদা বিখ্যাত, অধুনালুপ্ত কস্তার লাড্ডুর গল্প। আটা অথবা ময়দার সাথে খোয়া অথবা ক্ষীর বা ছানা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, কিসমিস, কাজুবাদাম, জায়ফল, জয়িত্রী এবং খুব অল্প পরিমাণ চিনি আর গরুর দুধে তৈরি ঘি একসাথে মেখে তৈরি করা হতো কস্তার লাড্ডু। আদতে সেটি উত্তরপ্রদেশ ঘরানার মিষ্টি। মানভুমের রাজার প্রতিদিন দুবেলার শেষপাতে মিষ্টি খাওয়ার শখ ছিল, আর ছিল শিকারের শখ। মুস্কিল হতো যখন রাজা শিকারের জন্য লম্বা সফরে বার হতেন। রাজার পছন্দের সবরকম মিষ্টি সঙ্গে গেলেও বেশিরভাগ মিষ্টি অতদিন ঠিক থাকত না, খারাপ হয়ে যেত। মিষ্টিগুলো ঠিক রাখার চেষ্টায় রাজমোদকদের

সমস্তরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা বিফল হয়েছিল। অবশেষে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে মরিয়া হয়ে রাজমোদকরা তাদের পরিচিত অধুনা উত্তরপ্রদেশের মোদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধানের জন্য। উত্তরপ্রদেশ থেকে কস্তার লাড্‌ডুর রেসিপি এসেছিল মানভুমের রাজমোদকদের কাছে। সেই লাড্‌ডুর স্বাদ এবং চেহারা দুটোই রাজার খুব পছন্দ হয়েছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা লাড্‌ডু খারাপও হতো না। যাইহোক, মানভুমের রাজা এবং রাজমোদকদের সাথেসাথে সেখানকার কস্তার লাড্‌ডুও বহুবছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাঁকুড়া পৌছতে পৌঁছতে খিদে পেয়ে যেত। কিন্তু অতো ধুলোমাখা বাসস্ট্যান্ডের দোকানে খাবার খেতে ঠিক ইচ্ছে করত না। অল্পস্বল্প ধুলো হলে হয়ত একটা চেষ্টা করলেও করা যেতে পারত! প্রায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ দাঁড়িয়ে আমাদের লালবাস রওনা দিত পরের ষ্টপেজ দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ, কি বড়জোর এক ঘণ্টার যাত্রা। সেই সাড়েপাঁচ ঘণ্টার যাত্রাপথে দুর্গাপুর ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে বাসটা পৌঁছনোর অপেক্ষায় আমি ছুটি শুরুর বহু আগে থেকে অপেক্ষা করে থাকতাম। সেই তাগিদটা ছিল বাড়ি পৌঁছনোর তাগিদের চেয়েও বেশি। আসলে দুর্গাপুরের ধুলোবালির সঙ্গে মিশে থাকা তখনকার কাছাকাছি সময়ের একটা ছিঁড়ে যাওয়া সম্পর্ক আর খিদের মুখে বাসষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষারত অশোকের মায়ের হাতে তৈরি লুচি, আলু-ছেঁচকি, জিলিপি - দুটোই আমাকে মাধ্যাকর্ষণের মত টানত। দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি কোনটা কম ছিল বলা মুস্কিল।

অশোক আর আমি ছিলাম দুর্গাপুরের স্কুলের বন্ধু, যাকে বলে একেবারে হরিহর আত্মা! ছুটি শুরুর মাসখানেক আগে ছুটির দিনক্ষণ অশোককে পোস্টকার্ডে লিখে জানিয়ে দিতাম। ঠিক দিনে ঠিক সময়ে বাসষ্ট্যাণ্ডে লুচি তরকারি নিয়ে ও আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। কাঁচের বোতলে করে জল আনত, সঙ্গে একটা কাঁসার গেলাসও। বাস থেকে নামা সম্ভব হত না অত্যধিক ভীড়ের কারণে। খেতে খেতে বাসের জানলার এপার ওপার থেকে দুই বন্ধু পনেরো-কুড়ি মিনিট গল্প করতাম। কয়েকমাসের জমে থাকা সব গল্প, পুরনো বন্ধুদের গল্প, পুরনো ইস্কুলের গল্প, আবার কবে দেখা হবে সেই আলোচনা। দুজনেই একান্তভাবে নিজস্ব উপলব্ধি থেকে বুঝতে পারতাম আর কোনোদিন আমাদের একসঙ্গে, এক জায়গায় থাকা হবে না। কেউ কাউকে কিছু বলতাম না।

দুর্গাপুরে মিনিট কুড়িপঁচিশ দাঁড়িয়ে ঠাসা ভীড় নিয়ে লালবাস জি টি রোড ধরে রওনা দিত আমার গন্তব্য বর্দ্ধমানের দিকে। মাঝে বুড়িছোঁয়ার মত করে দাঁড়াত পানাগড়, মানকর আর গলসীতে। দুপুর ঠিক পৌনে বারোটায় বাস এসে দাঁড়াত বর্ধমান ষ্টেশনের ঠিক বাইরে। সীতাভোগ, মিহিদানা ছাড়াও সেইসময়ের বর্দ্ধমানের খ্যাতি ছিল আরেকটি কারণে, সেটা ছিল শহরের অগুন্তি রিক্সা। বাস এসে দাঁড়াতেই রিক্সাগুলো মশামাছির মতো বাসটাকে ঘিরে ধরত। ষ্টেশন বিল্ডিং ছিল একেবারে নাকের ডগায় মাত্র শ-দুয়েক ফিট দুরে। তবুও ঐটুকু দূরত্বের জন্য রিক্সা আমাকে নিতেই হতো আমার মিলিটারি ট্রাঙ্কের জন্য।

আমার যাত্রার ঠিক সাড়েপাঁচ ঘণ্টা হয়েছে। লালবাস আমাকে আমার গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে। একটি কাকতালীয় ঘটনা দিয়ে

গল্পটা শেষ করব। একটানা তিনবছর ধরে, সাকুল্যে নয় থেকে দশবার এই যাত্রাটি আমাকে নিতে হয়েছে। কি করে জানি না, প্রথমবার থেকে শেষবার পর্যন্ত প্রত্যেকবার তপন নামের একই রিক্সাঅলা ট্রাঙ্কসমেত আমাকে ঐ শ-দুয়েক ফিট্ পার করে ষ্টেশন বিল্ডিঙের সিঁড়িতে নামিয়ে দিত। কি করে এটা সম্ভব হত আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনা। ভাড়া নিত চারআনা।

বয়সকালের জীবনযাত্রায় ট্রেন, প্লেন, গাড়ি এসবে করে ঘোরাঘুরি করার সময় মাঝেমধ্যে কখনোসখনো লালবাস আর মানভুমের ধুলো মনে পড়ে। অভ্যেসের তাড়নায় জামায় ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি। কিন্তু শেষমেষ পেরে উঠি না, শরীরে মিশে যাওয়া সাড়েপাঁচ ঘণ্টার সেই ধুলো থেকেই যায়।

১০/০৮/২০২৪

******

পূরবী

আমি যখন আট বছরের, ক্লাস থ্রীতে পড়ি, তখন ঠিক করেছিলাম পূরবীকে বিয়ে করব। খুব ছোট ছিল বলে ওকে কিছু বলিনি। অনিবার্য এক কারণে এইরকম সাহসী সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হয়েছিল। আমার টিফিনবক্সে বেশিরভাগ দিন থাকত রুটি আর আলুভাজা। যদিও আমার পছন্দের খাবার, তবু রোজ রোজ কত আর ঘস্‌ঘস্‌ করে চিবনো যায়। তাছাড়া টিফিন শেষ করতে এত সময় লাগত যে টিফিনে খেলার সময়টা কমে যেত। বাড়িতে অন্যরকম কিছু চাইবার উপায় ছিল না। যেসব বাচ্চারা বাড়ির খাবার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আর যারা ভর্তি বাসে পকেট মারে, আমাদের বাড়িতে উভয়কেই একই প্রজাতির প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হত। সমস্যাজর্জরিত ঐসব দিনগুলোতে পূরবী আমাকে রুটি আলুভাজার সাথে আচার খেতে শিখিয়েছিল। এটা অন্য ব্যাপার যে একটা বয়েস পর্যন্ত হাজার রকমের বারণের সঙ্গে, আমাদের বাড়িতে আমাদের আচার খাওয়াও বারণ ছিল।

মানবচরিত্রের এক জন্মসিদ্ধ অঙ্গ হচ্ছে অভিমান। পূরবীর অভিমান ছিল, আমার ছিল, আমাদের ক্লাসের সবার ছিল, সেই বয়েসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছোটছোট সব অভিমান। একদিন টিফিন পিরিয়ডে, একপাশে রাখা বালির ঢিবির ওপর গোল হয়ে বসে আমরা কজন মানে আমি, রবি, পূরবী, শিপ্রা আর তরুণ গল্প করতে করতে টিফিন খাচ্ছি। পূরবী আচারের একটা টুকরো আমাকে দিল। সেটা দেখে তরুণ ওর কাছে

আচারচাইল। নিজের ভাগ কমে যাবে বলে পূরবী ওকে দিল না। তরুণের জেদ চেপে গেছে, ও আচার নেবেই। আমাকে তাহলে কেন দিল জানতে চাইলে, কিছু কথা কাটাকাটির পর, পূরবী ব্রহ্মাস্ত্রটি নিক্ষেপ করেছিল "আমার মা ওর জন্য দিয়েছে"। দেওয়া না দেওয়ার সেই সূত্র ধরে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। চেঁচামিচিতে কে কোন পক্ষ বোঝা অসম্ভব। খেলা বন্ধ করে আরও দু-চারজন জুড়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি পরিস্থিতি তৈরি হল, সবার সঙ্গে সবার কথা বন্ধ হয়ে গেল, টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টাও পড়ে গেল। ক্লাসে ফেরার সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই পূরবী ফটাস্ করে আমাকে বলে দিল "তুই কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলবি না"। পূরবীর একতরফা সেই ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গে রুটি আলুভাজার সাথে আচারের অধ্যায় আমার শেষ। তবে, আচারের অধ্যায় শেষ হয়ে গেলেও, সেই মুহূর্ত থেকে অনভিজ্ঞ বাল্যবুদ্ধিতে বুঝতে না পারা এক অপরিচিত মোহে চিরজন্মের জন্য জড়িয়ে গেলাম।

মানুষের সম্পর্কগুলো সমুদ্রের ঢেউযের মত, সর্বক্ষণ ভাঙাগড়ায় মেতে থাকে। কোনটা কখন ভেঙে যাবে, নতুন একটা কখন গড়ে উঠবে, তার নির্ধারণকর্তা হচ্ছে একমাত্র 'সময়'। পরবর্তী দু-চার বছরে তরুণ, শিপ্রা আর আমি আমাদের স্কুল ছেড়ে বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। নিজের নিজের হোস্টেলজীবন শুরু হলো। পূরবী আর রবি পুরনো স্কুলেই থেকে গিয়েছিল। তরুণকে পরে একবারই দেখেছিলাম, নাগপুর এয়ারপোর্টে প্লেনের ভেতর থেকে উইণ্ডো সিটের জানলা দিয়ে। সুঠাম চেহারা আর কদমছাঁট চুলে আকর্ষণীয় চেহারার তরুণ বাস থেকে নেমে পাশের প্লেনে বোর্ড করছিল। রবি আর শিপ্রার সাথে পরে কখনো দেখা হয়নি, ওদের খবরও জানি না। স্কুলের শেষের

দিকে, শীতের ছুটির এক বিকেলে বাড়ির কাছাকাছি করঙ্গপাড়ায় গিয়েছিলাম মেলা দেখতে। একাই গিয়েছিলাম। ফেরার সময় বড় রাস্তা ধরে মেলার ভীড় ঠেলে ষ্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ পেছন থেকে মাথায় পড়েছিল বিরাশি-সিক্কার সশব্দ একটা চাঁটি। ঝনঝন্ করে ওঠা মাথা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে পেছনে তাকিয়ে দেখি লম্বা লম্বা আঙুলগুলো আমার চোখের সামনে নাচিয়ে পূরবী ফ্যাক্ফ্যাক্ করে হাসছে। ওরা অনেকে মিলে একসঙ্গে মেলা দেখতে এসেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে চাঁটির তীব্র জ্বালা, পথচলতি মানুষজনের ঘুরে দেখা, পূরবীর হাসির সঙ্গে অতীত থেকে উঠে আসা তরুণের রাগ, টিফিন পিরিয়ডে সমবেত ঝগড়া, আচারের গন্ধ - সবকিছু একসাথে মিশে গিয়ে আমার ভেতর সবকিছু কিরকম যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। খবর নেওয়া দূরের কথা, কোনো কথাই বলতে পারলাম না। পিঞ্জরাপোলের ট্রেন ধরার তাড়া ছিল ওদের। ওভারব্রীজের ওপর থেকে নীলরঙা শাড়ী-পড়া পূরবী রাস্তার ভীড়ের দিকে ইতিউতি তাকিয়ে আমাকে খুঁজে নিয়ে, চাঁটি দেখিয়ে, একমুখ হেসে ভীড়ে মিশে গেল। সময় আর দূরত্বের অত্যাচারে ছেলেবেলার সেই অজানা মোহ, যখন শেষ হয়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছি, তখন করঙ্গপাড়ার শীতের বিকেলে পূরবীর ক্ষণিক উপস্থিতি সেটাতে বোধহয় জীবনের সেই মোহতে সামান্য প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছিল।

বহুবছর পরে, এক কন্ফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য হিমাচলে প্রদেশের সোলানে দিনতিনেক থাকতে হয়েছিল। পাহাড়-পর্বতের একটি ধার্মিক গুণ আছে। তাদের বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য অনেকরকমের হয় - স্নিগ্ধ, রুক্ষ, কোমল, কঠিন এবং আরও নানারকম। তাই পাহাড় কখনো অসুন্দর হয় না। আমাদের রিসর্টটা ছিল হুবহু দেয়ালে টাঙানো ছবির মত, পাহাড়ের গায়ে

টাঙানো। গাড়ি থেকে নেমে গোটা কুড়ি সিঁড়ি উঠে রিসেপশন। সেখান থেকে তেইশটা সিঁড়ি উঠে রুমে পৌঁছতে হয়। রুমের দরজার ঠিক বাইরের প্যাসেজ থেকে উঠে গেছে পাহাড়ের খাড়াই। সামনেদিকের বারান্দা থেকে নিশ্চল হিমালয় দেখতে দেখতে সময়জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। কনফারেন্স শেষে চতুর্থদিনে সবার বাড়ি ফেরা, বিশেষকরে নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার তাড়া। আমার তাড়া ছিল না। কারণ আমার নিজস্ব কোনো পরিবার ছিল না। না থাকার পেছনে অবশ্য গুপ্ত রহস্য-টহস্যও কিছু ছিল না। সংসার আজ গড়ব কাল গড়ব করে গড়িমসি করতে করতে কবে যে চুলে পাক ধরেছে খেয়াল করিনি। যখন খেয়াল হল, তখন ভাবলাম মধ্যবয়সে আর এসবে জড়িয়ে কি হবে। সবাই নিজের নিজের জায়গায় রওনা দিল। আমি চলে গেলাম একেবারে উল্টোদিকে সিমলা ছাড়িয়ে নারকাণ্ডায়, হিমালয়ের শরীরে শরীর এলিয়ে দুদিন কাটিয়ে আসতে। ফেরার পথে একরাতের জন্য উঠেছিলাম সোনালের সেই রিসর্টেই। শেষদিন সকালে রওনা হবার আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি। একদম নীচে কার-পার্কে দু-চারটে ফ্যামিলির জিনিসপত্র গাড়িগুলোতে তোলা হচ্ছে। ছুটছাট কথাবার্তার ছেঁড়াখোঁড়া আওয়াজ পায়রার পালকের মত ভেসে আসছিল। এক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা দুই কিশোর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। ডিজেলের গন্ধ আলতো করে চারিদিকে ভাসিয়ে দিয়ে, গাড়ি গেটের দিকে সামান্য একটু গড়িয়েই থমকে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলাকে দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে এসে কর্মচারীদের টিপ্স দিচ্ছেন। ভুলে গিয়েছিলেন নিশ্চয়। তারপর রিসেপশনের দিকে মুখ তুলে কারের দিকে হাত নেড়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি বেরিয়ে গেল। পূরবীকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। এক অন্যমনস্ক মন নিয়ে

ফেরার রাস্তা ধরেছিলাম। মধ্যবয়সের সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে সেদিন প্রথম অনুভব করি কিছু মোহ কখনও নশ্বর হয় না, চিরন্তন হয়ে থেকে যায়।

আমি চিরদিন দায়দায়িত্বশূন্য একা একজন মানুষ। আমার জীবনযাত্রা মোটামুটিভাবে একটা সরলরেখায় চলতে অভ্যস্ত। চাকরি আমাকে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরিয়েছে। যেখানে যখন থাকি সেটাই আমার দেশ হয়ে যায়। জীবনের অনেকখানি সময় সেইসব জায়গার স্বাদ, গন্ধ, জীবনশৈলী জানতে, বুঝতে আর আবিষ্কার করতে কেটে গেছে। এই অভ্যেসটা আমার ভালো লাগে। বাকি যে সময়টা হাতে থেকে যায়, আমি লেখালিখি করে সেটা ব্যহবার করার চেষ্টা করি। কয়েকযুগ আগে, হোস্টেলে থাকার সময় সুজিত খানিকটা জোর করেই আমাকে লেখালিখির অভ্যেস করিয়েছিল। নিজে লিখতে ভালবাসত। আমাকে কখনো বিষণ্ন দেখলে লিখতে বলত। ইচ্ছেমতো যা খুশি লেখা। আমার ভালো লাগত না। আমি বলতাম "কি হবে লিখে"? বলত "লিখে দেখ্, লিখলে ভালো লাগে"। অপছন্দের সেই লেখা আজ অভ্যেসে পরিণত হয়ে আমার জীবনপদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। রোজকার জীবনে সামান্যতম অস্বস্তির উদ্রেক হলে আমি লিখতে বসে যাই, বেপরোয়াভাবে নিশ্চিন্তমনে পাতার পর পাতা লিখি। সেইসব লেখার আমিই লেখক, আমিই পাঠক, আমিই সমালোচক। লেখা পছন্দ না হলে কাটাকুটি করে ঠিক করার চেষ্টা করি না, ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখি।

তিন বছর আগে চাকরির অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। সমাপ্তির বছর দুয়েক আগে বন্ধুর ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে দিনকয়েক বরোদায় কাটিয়েছিলাম। শহরটা ভালো লেগেছিল। ভাবতাম এই শহরে বিশ্বমিত্রির কাছাকাছি বসতি করলে মন্দ হয় না।

শেষপর্যন্ত বিশ্বামিত্রির কাছাকাছির মধ্যে মাঝারি মাপের এক হাউসিং কমপ্লেক্সে এগারোতলায় ফ্ল্যাট নিয়েছি। মন বলছে এটাই হয়ত শেষ অধিবাস। টাকাপয়সা দেওয়া আর সইসাবুদ করা ছাড়া আমাকে আর কিছুই করতে হয়নি। বন্ধু আর তার বৌ মিলে বাড়ি খোঁজা থেকে বাড়ি গুছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সবকিছু করে দিয়েছিল। ব্যালকনি থেকে বিশ্বামিত্রির রুপোলি স্রোত দেখা যায়, সন্ধ্যের সময় নীচের লনে ছোটদের খেলাধুলো দেখা যায়। অনেক উঁচু থেকে বরোদা শহরের ওপর বর্ষার বৃষ্টি পড়তে দেখা যায়।

তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেলে যেদিন ইচ্ছে হতো লনে গিয়ে পায়চারি করতাম। সূর্য সামান্য ওপরে উঠলে চলে আসতে হতো, বরোদা শহরের সূর্য্যের তেজ অনেক। একদিন সাতসকালে লনের বেঞ্চে বসে লোকজনের এক্সারসাইজ করা দেখছি। স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে সবার কাছে সারাদিনের এইটুকু সময়ই বরাদ্দ। আরও অনেকের মত দুজন মহিলা নিবিষ্ট মনে গল্প করতে করতে হাঁটছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাশের বেঞ্চে এসে বসলেন, বিশ্রামের প্রয়োজনে হয়ত। পৃথিবীর সব পার্কের ছবি এই একইরকম! কিছুক্ষণ পরে পাশ থেকে আচমকা কানে এল "একি, তুই"! তাকিয়ে দেখি পূরবী। কেন জানি না, হঠাৎ ঐ জায়গায় ঐ মুহূর্তে ওকে দেখে আমি একটু থতমত খেয়ে গেছিলাম। মনে হল ওর বন্ধুটি আমাদের পুরনো পরিচিতি আন্দাজ করে চলে যেতে চাইছে। যাইহোক, আমাকে নিজের ফ্ল্যাটের নম্বর দিয়ে সন্ধ্যেবেলা আসতে বলে ওরা চলে গেল।

পূরবীদের বসার ঘর সুন্দর করে সাজানো, ছিমছাম। সোফাতে বসে চায়ের কাপ হাতে ওদের সম্বন্ধে কিছুকিছু জানা গেল। আগে চণ্ডীগড়ে থাকত। অনেকসময় উইকএণ্ডগুলো

সোলানে গিয়ে কাটিয়ে আসত। কুড়ি বাইশ বছর আগে চাকরি বদল করে ওর হাজব্যাণ্ড বরোদায় চলে আসেন নতুন চাকরি নিয়ে। রিটায়ার্মেণ্টের পর ওরা এখানে সেট্‌ল্‌ করে যায়। দুই ছেলে বিদেশে থাকে। হাজব্যাণ্ড গত হয়েছেন চার বছর আগে। তারপর থেকে পূরবী এখানে একাই থাকে। ঘণ্টাখানেক গল্পটল্প হল। মাঝেমাঝেই গল্পের খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। আসলে ষাট বছরের জমা ধুলো পরিষ্কার করা কারোর পক্ষে সহজ হয় না। মেশিন হয়ত সেই কাজটা করতে পারে, তবে মানুষ তো আর মেশিন নয়! একদিন দুপুরে খেতে বলেছিল। ডাইনিং টেবিলের ওপর এক পাশে ডিজাইনার কাপের মধ্যে ছুরি, কাঁটা, চামচ রাখা আছে। তার পাশে একটা ট্রের ওপর রাখা আছে কয়েকরকম আচার, ঘি, রাজস্থানি মুখশুদ্ধি, নুন-গোলমরিচের জায়গা। আর আছে একটা ট্যাবলেটের শিশি। তাকিয়ে আছি দেখে মুচকি হেসে পূরবী বলল ওটা হজমি গুলির শিশি। সাধারণ বাঙালি ঘরানার রান্না। এ গল্প সে গল্পের মধ্যে বলল "ছেলেরা বারবার বলছে ওদের কাছে পাকাপাকি ভাবে চলে যেতে"। নিজে কি ঠিক করেছে জানতে চাইলে বলল "আসলে, যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছি না। মুস্কিল হয়েছে আলোচনা করার লোকটি তো আর নেই"। একটু চুপ করে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করল "একটা পরামর্শ দিবি"? বললাম "পারলে দেব না কেন"? একটু দম নিয়ে বলল "আচ্ছা, তোর কি মনে হয় - এখান থেকে এই বয়েসে পাততাড়ি গুটিয়ে একেবারে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে"? এ তো মহা সমস্যায় পড়লাম। সাংসারিক ব্যপারে কোনো প্রশ্ন বা আলোচনা আমার সঙ্গে আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন করেনি, পরামর্শ চাওয়া তো অকল্পনীয়। পূরবীর প্রশ্নের কি উত্তর হয় আমার জানা নেই, উত্তর দেওয়া কিভাবে এড়িয়ে যেতে হয় তাও জানা নেই। এসব ক্ষেত্রে কতটা কি বলা

উচিত বা অনুচিত তাও জানি না। এইসব ভাবতে ভাবতে অনেকসব অতীত একসঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো আমার সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল।

পূরবী আর আমি নিজেদের কাছে সেই অর্থে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদের মধ্যে শেষবার কথা হয়েছিল ষাট বছর আগে। সেই কথায় আচমকা পূর্ণচ্ছেদ কিন্তু পূরবী টেনেছিল "তুই কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলবি না" বলে। হলোই বা দুই আট বছরের মধ্যেকার রাগারাগির কথা, কিন্তু কথাটা বলে তো ছিল! রোজ আচার খাওয়াত বলে, একতরফাভাবে কথা বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার সেদিন কোথা থেকে পেয়েছিল জানি না। সেদিনটা হয়ত এখন ওর মনে নেই। আমি কিন্তু ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারিনি। সেই কথাটার না-বোঝা ওজন সুপ্ত বীজের মত এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি। তাছাড়া, এইসব সাংসারিক বিভ্রান্তি আমার জন্য নয়, জীবনে কখনো এসবকে কাছে ঘেঁসতে দিইনি। আমার জীবনশৈলী কোনদিনই অসাধারণ নয়, কিন্তু চিরকাল সাধারণ থেকে পুরোপুরি আলাদা। যাক্‌গে সেসব কথা! তখনকার মত "দু-চার দিন ভাবতে সময় দে" বলে পাশ কাটিয়ে গেলাম।

পরের কয়েকটা দিন একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছিল। জীবনভোর জড়পদার্থ হয়ে থাকা পুরনো সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান নিমেষে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, পূরবীর দুবিধা নিয়ে অহেতুক চিন্তাভাবনায় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়লাম। ওর এখানে থেকে যাওয়ার কি সুবিধা বা অসুবিধা, ছেলেদের কাছে চলে গেলে কি সুবিধা বা অসুবিধা, সেখানে থাকলে পূরবীর সুখশান্তি স্বাধীনতার কি হবে, এখানে যদি থেকে যায় আমি কিভাবে ওকে সাহায্য করতে পারি ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং আরও

এরকম হাজারটা ‘ইত্যাদি’। স্বার্থপরের মত এটাও মনে হল আমরা দুজনেই এখন বয়েসে ভারী। ও এখানে থেকে গেলে প্রয়োজনে আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারি, সাহায্য করতে পারি। অবশেষে, যত না পূরবীর বিভ্রান্তি দূর করতে, তার একশগুণ বেশি নিজের এই বিশৃঙ্খল, পাগল করা চিন্তাভাবনা থেকে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে পূরবীর সঙ্গে এক দুপুরে স্কাইরুফে খেতে গেলাম। সুন্দর পরিবেশ। ভেজিটেরিয়ান রেষ্টুরেন্ট। চার বছর হলো পূরবী আমিষ খাবার থেকে সরে গেছে। খেতে খেতে টুকটাক কিছু গল্পের পর এদেশে থাকা না থাকার সুবিধা অসুবিধাগুলো খুব সাবধানে ওর সামনে রাখার চেষ্টা করছিলাম। আমার দিকে এক স্থির অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার কথাগুলো শুনছিল। কেন জানি না, মনে হচ্ছিল আমার কোনো কথাই পূরবীর কানে প্রবেশ করছে না। মনে হলো যেন ও আরো অনেক গভীরের অন্য কোনো ভাবনায় ব্যস্ত। স্কাইরুফের নমনীয় পরিবেশে সেদিন খাওয়াদাওয়ার অছিলায় অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলা হল, অনেক না-বলা কথা বোঝা গেল।

ফিরে এসে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে চলে যাওয়ার আগে চেহারায় একরাশ স্বস্তি নিয়ে বলল "ছেলেদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা খুশি"। আমার হতবাক বিহ্বলতা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে পূরবী বলল "ওদের কাছে যাচ্ছি না"। তারপর একটু থেমে সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে বলল "চল না, বাকি জীবনটা আমরা দুজন এখানেই কাটিয়ে দিই, একসঙ্গে"।

৩০/০৮/২০২৫

******

চিলিকা (চিল্কা)

কলেজে পড়ার সময় একবার আমাদের ডিপার্টমেন্টের জনাকুড়ি ছাত্রছাত্রী মিলে আমরা বিশাখাপত্তনম এবং আরাকু ভ্যালি বেড়াতে গিয়েছিলাম অ্যানুয়াল এক্সকারসনে। দিন সাতেকের বেড়ানো। শান্তিনিকেতন থেকে হাওড়া। হাওড়া ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটিয়ে পরেরদিন সকালের শেষের দিকে ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরে বিশাখাপত্তনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া।

পুরো ভ্রমণসূচীতে আমাদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল চিলিকা লেক দেখতে পাবো বলে। 'চিলিকা' শব্দটির উচ্চারণ মানুষের মুখেমুখে বহু আগে 'চিল্কা' হয়ে গেছে। বহু আগে 'হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যের সময় কটক ঢুকত। তারপর ভুবনেশ্বর, খুরদা হয়ে বালুগাঁওয়ের পথে এগিয়ে যায়। সেখান থেকে রাত নটা-দশটা নাগাদ ট্রেন চিল্কা লেকের পাশ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে যায়, তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাওয়া যায়। দিনের আলো ফুরিয়ে গেলে জানলার বাইরে তাকিয়ে বোঝা যাচ্ছিল রাতটি হবে জ্যোৎস্না অধ্যুষিত। আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল সেদিন পূর্ণিমা ছিল কিনা তাই নিয়ে। অচেনা এক সহযাত্রীর কাছে জানতে পেরেছিলাম সেদিন ছিল পূর্ণিমা। পূর্ণিমার আলোয় চিল্কাকে ভালো করে উপভোগ করার আশায় তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া শেষ করে

আমরা তৈরি। কামরার সব আলো নিভিয়ে দিয়ে জানলাগুলোর পাশে জড়ো হয়েছিলাম।

প্রচলিতভাবে মনে করা হয় ওড়িয়া ভাষায় চিলিকা শব্দটির অর্থ সম্ভবত ‘জলে ঢাকা মাটি’ অথবা নামটি এসেছে স্থানীয় 'চিল্লি' গাছ থেকে। নদনদীর দেশ ওড়িশার ভার্গবী, দয়া, মাকরা, মালাগুনি ও লুনা নদীসহ মোটামুটি বাহান্নটি প্রবাহ বা স্ট্রিম চিল্কা হ্রদে মেশে। হ্রদটি সর্বাধিক ১১৬৫ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই আয়তন কিন্তু বর্ষাকালের। বছরের অন্য সময়ে এই বিস্তৃতি প্রায় তিনশ বর্গকিমি মত কমে যায়। চিল্কা ভারতের তথা এশিয়ার বৃহত্তম উপকূলীয় নোনা জলের উপহ্রদ বা ইংরেজিতে লেগুন এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। প্রথম স্থানটি দখল করে আছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ ক্যালিডোনিয়ান লেগুন। চিল্কার গভীরতা খুব একটা বেশি নয়, সর্বাধিক মোটামুটি চোদ্দ ফিট মতো। তীরবর্তী শহরগুলির অর্থনীতি চিল্কার জলজ পণ্য বা মেরিন প্রডাক্ট এবং ট্যুরিজিমের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ - বিশেষকরে বাগ্‌দা চিংড়ি এই হ্রদে ব্যাপাক ভাবে হয় এবং রপ্তানি হয়। পুরী জেলার দক্ষিণ থেকে একেবারে অন্ধ্রপ্রদেশ বর্ডারের বেরহামপুর (বর্তমান নাম ব্রহ্মপুর) পর্যন্ত অসংখ্য ফিশ প্রসেসিং ফ্যাক্টরি। চিল্কার মাছ, বিশেষত চিংড়ি, এই ফ্যাক্টরিগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়। ট্যুরিষ্টদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ কয়েকশ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এবং সময়বিশেষে ইরাবতির ডলফিন, সঙ্গে রসনা তৃপ্তির জন্য বিভিন্ন রকম মাছ আর কাঁকড়া তো আছেই।

ট্রেনের জানলার ধারে বসে চিল্কার জন্য অপেক্ষা করতে করতে নিরঞ্জনের কথা মনে পড়ছিল। নিরঞ্জন আর আমি একই স্কুলের একই ক্লাসে পড়তাম। ইলেভেনে পড়ার সময় হোষ্টেলে আমরা রুমমেট ছিলাম। কটকের ছেলে নিরঞ্জন সাহু ভীষণ ভালো পেন্সিল স্কেচ করত। একেকদিন সন্ধ্যেবেলায় স্টাডিরুমে পড়াশোনার আবহাওয়াটা খুব হাল্কা থাকত। গল্পস্বল্প, ঘুরে বেড়ান কোনো কিছুই করা যেত না কারণ সন্ধ্যেবেলায় স্টাডিরুমে একজন শিক্ষক স্টাডি সুপারভাইজার হয়ে অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। ঐরকম সন্ধ্যেগুলোয় নিরঞ্জনের দরকার পড়ত। স্টাডি সুপারভাইজারের কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ স্কেচ ও এঁকে দিত। সেই স্কেচগুলো স্টাডিরুমের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত হাতে হাতে ঘুরে বেড়াত যতক্ষণ পর্যন্ত না ডাইনিং হলের ঘণ্টা পড়ে। নিরঞ্জনের আর একটি খুব আশ্চর্যজনক গুণ ছিল। প্রতিটি পরীক্ষার আগে সঠিক বলে দিতে পারত ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি আর অঙ্কে ও কতো করে নম্বর পাবে। জিজ্ঞেস করলে এটা ও বলে দিত পরীক্ষা শুরুর দিন সাতেক আগেই। আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল ওর সেই ভবিষ্যতবাণীর সফলতার হার ছিল শতকরা পঁচানব্বইয়ের ওপর। বাকি পাঁচ পারসেণ্টের ক্ষেত্রে তফাতগুলো কখনও দুই বা তিন নম্বরের বেশি হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। চিল্কার গা ঘেঁষা বারকুলে ছিল ওর মামাবাড়ি। সেখানে গেলে বেশিরভাগ সময় ছোটমামার সঙ্গে নৌকা করে চিল্কায় ভেসে বেড়াত। কোনো এক আড্ডায় নিরঞ্জন একবার আমাদের বলেছিল "চাঁদের আলোয় যে একবার চিল্কা দেখেছে পৃথিবীতে তার আর কোনেকিছু দেখার দরকার নেই"।

এই কথাটা শোনার বছর তিনেক পরে দুলকিচালে গড়িয়ে চলা ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেসের জানলা দিয়ে কলেজের সহপাঠীদের

সাথে চিল্কা দেখেছিলাম। সেই রাতে দিকচক্রবাল পর্যন্ত সে চাঁদের আলোয় ডুবে ছিল। অনেকটা দুরে বোধহয় দুচারটে নৌকার শিল্যুয়েট দেখা যাচ্ছিল। ঐরকম কিছু দূরত্বে একটা ছোট্ট দ্বীপের শিল্যুয়েটও দেখা যাচ্ছিল। জানিনা সেটাই পক্ষীদ্বীপ ছিল কিনা। আরও বছর সাত-আট পরে অফিস থেকে পিকনিক করতে গিয়ে বালুগাঁও থেকে বোটিং করে আমরা পক্ষীদ্বীপে গিয়েছিলাম। চড়া রোদে খুব যে একটা উপভোগ করেছিলাম বলা যাবে না। চিল্কার শরীর থেকে উঠে আসা চাঁদের আলো-বিচ্ছুরিত, মন অবশ করা ছোটোছোটো চিক্‌মিক্‌ শান্ত লহরী রেললাইনের গায়ে ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে চিল্কার উপস্থিতি জানান দিয়ে যাচ্ছিল। সেই স্বপ্নীল দৃশ্য হতবাক হয়ে আত্মস্থ করা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কোনো পথ ছিল না।

স্কুল ছাড়ার পর থেকে নিরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কিন্তু কলেজে পড়ার সময় সেই চাঁদে ডুবে থাকা চিলিকা উপভোগ করতে পারার জন্য আমার ধন্যবাদ একান্ত ভাবে ওর প্রাপ্য।

০৪/০৩/২০২৬

*****

সরাইকেল্লা

জামশেদপুর থেকে সরাইকেল্লার দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটার মত। সিঙ্গল রাস্তা হলেও খুব মসৃণ। আজ থেকে বছর চল্লিশেক আগে এই দূরত্ব পার হতে মিনিট চল্লিশ লাগতো। জামশেদপুর থেকে টাটানগর ষ্টেশনের দিকে যাওয়ার রাস্তায় বিষ্টুপুর পেরিয়ে ডানদিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেটা পৌঁছে দেয় সরাইকেল্লা হয়ে চাইবাসা। ডানদিকে ঘুরে প্রথমে আসে খরকাই নদীর ওপর খরকাই ব্রীজ। সারা বছর শান্ত থাকলেও বর্ষাকালে তার জল আর স্রোত মিলিয়ে সে এক উগ্র সুন্দরীর রূপ নেয়। ওড়িশার সিমলিপালের শ-চারেক ফিট উঁচু টুংড়ু আর দরবারমেলা পাহাড়দুটো থেকে নেমে এসে রাইরঙপুর শহরকে পাশ কাটিয়ে তখনকার বিহারে, অধুনা ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করে। তারপর জামশেদপুর আর তার উপনগর আদিত্যপুরের সংযোগকারী খরকাই ব্রিজের নীচ দিয়ে বয়ে গিয়ে অবশেষে জামশেদপুরেরই অপর প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া আরেক স্রোতস্বিনী, সুবর্ণরেখায় মিশে যায়। খরতাপ নদীর সম্পূর্ণ যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য একশ তিরিশ কিলোমিটার।

খরকাই ব্রীজ পেরিয়ে প্রথমে আসে আদিত্যপুর, তারপরে গামহারিয়া। এই দুটো জায়গায় টাটা কোম্পানির ইণ্ডাষ্ট্রিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকম আনুষঙ্গিক অর্থাৎ অ্যানসিলিয়ারি কারখানাগুলি গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো। আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন

উচ্চতার চিমনিগুলো থেকে ধূসর রঙের অর্গলহীন নিক্ষিপ্ত ঘন ধোঁয়া আর কারখানাগুলির ভেতর থেকে দেয়াল টপকে ছিটকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন তীব্রতার ধাতবিক সব আওয়াজ মিলেমিশে একাকার হয়ে এই দুই শহরকে নিরন্তর আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখত। সেই গামহারিয়া পার হলেই পৃথিবীটা আচমকা কিরকম যেন অচেনা হয়ে যেত। প্রকৃতির বর্ণ, গন্ধ, রঙ সবকিছু পাল্টে যেত। এই পরিবর্তন এতটাই আকস্মিকতায় ভরা যে নিজের দৃষ্টি, মন, অনুভূতিগুলো আলাদাভাবে অথবা একত্রিতভাবে সমন্বিত করবার সময় পাওয়া যায় না। গামহারিয়া ছাড়িয়ে গেলেই মনে হত যেন প্রকৃতি তার আনুষ্ঠানিক পোশাক ছেড়ে দৈনন্দিন জামাকাপড় পড়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। আরও তিরিশ কিলোমিটার এগিয়ে সরাইকেল্লা।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে সরাইকেল্লার অল্পবিস্তর যেটুকু ইতিহাস জানা যায় তাতে ইতিহাস আর কল্পনার মিশ্রণ কতখানি তা বলা বা বোঝা মুস্কিল। তবে যেটুকু জানা যায় সেটা যে বেশ আকর্ষণীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ষোলশ কুড়ি সালে এখান থেকে পঁচাত্তর কিলোমিটার পশ্চিমে সারাণ্ডার গভীর জঙ্গলে অবস্থিত, পোরহাটের রাজা ছিলেন জগন্নাথ সিং (তৃতীয়)। সরাইকেল্লা তখন সরাইকেল্লা ছিল না। এই অঞ্চলের তখন পরিচিতি ছিল 'সিংভূম পীর' নামে। বারোটা গ্রাম নিয়ে একশ তিরিশ স্কোয়ার কিলোমিটার তার ব্যপ্তি। ভৌগোলিক অবস্থান ছিল খরকাই এবং সঞ্জয় নামের দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। রাজ্যের ভৌগোলিক প্রসারণের উদ্দেশ্য নিয়ে জগন্নাথ সিং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কুঁওর সিংকে এই জায়গার দায়িত্বে পাঠায়েছিলেন। জায়গাটার নতুন নামকরণ করা হয়েছিল সরাইকেল্লা। সিং বংশের চতুর্থ প্রজন্মের বংশধর

কুঁওর বুধা বিক্রম সিং (প্রথম)-য়ের রাজত্বকালকে এই রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। সিংদের রাজত্বে সরাইকেল্লা সেই সময়কার সম্ভবত একমাত্র স্টেট ছিল যেটা মুঘলরা বা মারাঠারা কেউই দখল করতে পারেনি। প্রোমালগামেশন সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার এদের কাছ থেকে কোনদিন 'নজরানা' নেয়নি। সিং রাজারা সরাসরি আটান্ন প্রজন্ম ধরে একটানা আটশ বছর রাজত্ব করে গেছে। এতো দীর্ঘ সময়ে কাউকে দত্তক নেবার প্রয়োজন পরেনি। রাজবংশের গৃহদেবতা মা পৌড়ী - মা দুর্গার অন্যতম একটি রূপ। আবাসিক এই রাজবাড়িটি ভীষণ সুন্দর। সেখানে রাজপরিবারের সদস্যরা এখনও বসবাস করেন। একটাই আফসোস, আবাসিকতার কারণে রাজবাড়ির ভেতরটা কোনোদিন ঘুরে দেখবার সুযোগ হয়নি। একই ভাবে আরও বড় একটি আক্ষেপ থেকে গেছে। ক্যামেরা ছিল না বলে কোনো ছবি তুলে রাখতে পারিনি।

উন্নতমানের শিল্পসংস্কৃতি সমৃদ্ধ সরাইকেল্লা ছৌ নাচের অন্যতম প্রতিষ্ঠাভুমি হিসেবেও পরিচিত। অন্য দুটি হলো ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ এবং বাঙলার পুরুলিয়া। সবচেয়ে বড় আফসোস যেটা এখনও বয়ে বেড়াতে হয়, সেটা হচ্ছে সরাইকেল্লার ছৌ নাচ কখনো সরাইকেল্লায় বসে দেখেনি। এটা কিন্তু চেষ্টা করলে দেখা যেতে পারত।

২৮/১০/২০২৫

******

কৌতূহল

মাঝবয়েস থেকে আমার মনের ভেতর একটা অদ্‌ভুত ধরনের কৌতূহল মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। মনে করার চেষ্টা করতাম আমার স্মৃতিতে সবচেয়ে পুরনো কোন কোন মানুষগুলির মুখ আমার এখনও মনে আছে, তাদের নাম মনে আছে। চেষ্টা করতে গিয়ে এরকম অনেকের মুখ মনে পড়ছে যাদের নাম মনে পড়ছে না। আবার অনেকের নাম মনে পড়ছে তো মুখ মনে পড়ছে না। তার ওপর আবার সাল, তারিখের হিসেবে মনে পড়া মানুষগুলো এত আগে পরে হয়ে যাচ্ছিল যে একটা সময় খানিকটা হতাশ হয়ে সেই চেষ্টায় দাঁড়ি টানার কথা ভেবেছিলাম। তবে এতো হতাশা সত্ত্বেও, আজ এই অপরাহ্নবেলায় এসে নতুন করে আরেকটি ভাবনা মাঝেসাঝে বিরক্ত করতে শুরু করেছে। ভাবছি এখনো যদি আমার সেই পুরনো কৌতূহলকে উপেক্ষা করে পুরনো মানুষগুলিকে সামনে নিয়ে আনার চেষ্টা না করে আড়ালেই থাকতে দিই তাহলে হয়তো দেরি হয়ে যাবে। আর দেরি হয়ে গেলে আমার কৌতুহলের উৎসের সেইসব মানুষগুলো চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। তাই অনেক মুখের সমাগম থেকে এলোমেলোভাবে তিনজন মানুষকে বেছে নিয়ে আজকের এই লেখা।

গদাইবাবু

আমাদের ছোটবেলায় এমন অনেক মানুষকে দেখেছি যাদের মুখে প্রচুর ছোটছোট গর্তের ছাপ থকত। কারোর কারোর আবার কোনো একটা চোখের মণি ঘোলাটে হত। সবমিলিয়ে তাদের উপস্থিতি আমাদের মনে অস্বস্তির উদ্রেক করলেও কোনমতেই ভয়ের সৃষ্টি করত না। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে অনেকের মুখে সেই দাগ দেখেছি। ঐরকম গর্তের ছোপ ছোপ দাগ ছিল গুটিবসন্তের দাগ। পোষাকি নাম স্মল্‌পক্স। ভ্যারিওলা ভাইরাস থেকে সৃষ্ট একসময়ের সেই অসুখ ছিল মারাত্মক রকমের ছোঁয়াচে এবং সাংঘাতিক কষ্টদায়ক। প্রতি একশজন আক্রান্তের মধ্যে মোটামুটিভাবে তিরিশজন মারা যেত। যারা সুস্থ হয়ে উঠত তাদের মুখে এবং তাদের মধ্যে অনেকের চোখে গুটিবসন্ত সারাজীবনের জন্য স্থায়ী নিশানা রেখে যেত।

গদাইবাবু ছিলেন গুটিবসন্তের নিশানা বহনকারী সেইরকম একজন মানুষ। প্রথম দেখা বোধহয় ঊনিশশো একষট্টি অথবা বাষট্টি সালের শীতকাল নাগাদ। শীতকালই হবে কেননা ওনাকে সবসময় বাঁদরটুপি পড়া অবস্থাতেই দেখেছি। কাজকর্মের ব্যাপারে বাবার সঙ্গে প্রায় দেখা করতে আসতেন। আসতেন একটা বেশ মোটাসোটা মোটরসাইকেলে চালিয়ে, জলদগম্ভীর ঢোক্ ঢোক্ ঢোক্ ঢোক্ আওয়াজ করতে করতে। গদাইবাবুর নিজের চেহারাও ছিল ওনার বাহনের মতোই ভারী এবং ওজনদার। বাহনের গর্জন আর মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ আমাদের কাছে এক রকম লাগত। সেই আওয়াজকে নিয়ে ঐটুকু বয়সে আমরা হাসাহাসি করতাম গদাইবাবুর মেঘ ডাকছে বলে। নিজেও বেশ গম্ভীর প্রকৃতির

মানুষ ছিলেন বলে ছোটদের কাছে গদাইবাবু খুব একটা আকর্ষণের কারণ ছিলেন না। আমরা একটুখানি দূরে দূরেই থাকতাম। সুযোগ পেলে লুকিয়েচুরিয়ে মোটরসাইকেলটা কোনোমতে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করতাম। কখনো যদি দেখে ফেলতেন, চেঁচিয়ে বকুনি দিতেন "এ্যাইই, ছুঁবিনা একদম! ঘাড়ের ওপর পড়লে সবকটা একসাথে মরবি"। বকুনি সত্ত্বেও আমাদের সবার মনে একটা ভয় মেশানো লোভ সবসময় থেকেকেই যেত। লোভটা ছিল যদি গদাইবাবু একবার মোটরসাইকেলে চড়িয়ে আমাদের এক পাক ঘুরিয়ে আনেন তাহলে বেশ মজা হয়। আর ভয়টা ছিল যদি পড়ে গিয়ে হাত-পা কেটে যায় তাহলে বাড়িতে অবধারিত বকুনি খেতে হবে।

সেই গদাইবাবু একদিন সকালবেলা বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় মোটরসাইকেল থেকে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়ে সঙ্গেসঙ্গে মারা যান। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই সেই ঘটনা ঘটেছিল। পাড়ার কাকা জেঠুরা অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন সেটা মনে আছে। বিকেলবেলা আমরা বন্ধুরা - মানে আমি, রবি, কমল আর জয়া গদাইবাবুর অ্যাকসিডেণ্টে মারা যাওয়া নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম। মিনিটখানেকের সেই আলোচনা সেরে আবার নিজেদের মধ্যে লুকোচুরি খেলায় মন দিয়েছিলাম। মোটরসাইকেলটায় চড়া হয়নি বলে আমাদের সবার আক্ষেপ হতো।

কেষ্টবাবু

এবারের বর্ণনা আরও কয়েকমাস আগেকার। বর্ণপরিচয়ের দুটো ভাগ শেষ করার পরে হাতে এসেছিল প্রথম গল্পের বই রামায়ণ আর মহাভারত। হুবহু এখনকার কার্টুন বইয়ের মতো

দেখতে এবং সাইজের দুটো বই একইসঙ্গে এসেছিল। একদিন সকালবেলায় একতলার উঠোনে আমার বোনকে কেমন করে পাঁঠাবলী করতে হয় শেখাচ্ছিলাম। দুজনের হাতে একটা করে চ্যলা কাঠের টুকরো। আমরা যখন এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত, তখন গলির দরজায়, যেটা ছিল বাইরে যাওয়া আসার একমাত্র দরজা, কেউ কড়া নেড়েছিল। পাল্লাদুটোর মাঝামাঝি জায়গায় আড়াআড়িভাবে লাগানো লোহার শেকল আমার নাগালের মধ্যে থাকায় দরজা খুলতে অসুবিধা হয়নি। সামনে দাঁড়িয়েছিলেন ধবধবে সাদা ধুতিপাঞ্জাবী পরা, টানটান করে ব্যাকব্রাশ করা চুল, চোখে কালো রঙের মোটা ফ্রেমের চশমা পরা একজন বেশ গম্ভীর গম্ভীর লোক। যতদূর মনে পড়ে ওনার মুখে পান ছিল। ভারী গলায় বললেন "বাবাকে ডাকো"। বাবা বাড়ীতে নেই বলাতে দুটো বই আমার হাতে দিয়ে বললেন "বাবাকে দিয়ে দিও"। তারপর কথা নেই বার্তা নেই, জিজ্ঞেস করে বসলেন "পড়তে পারো"? বোনের সামনে মানসম্মান প্রায় লুটিয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলেছিলাম "পড়তে পারি"। তারপর বলা ঠিক হবে কি হবেনা ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললাম - "লিখতেও পারি"।

- কি বই পড়েছো?
- বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ।
- দ্বিতীয় ভাগ পড়োনি?
- ওটাও পড়েছি।
- বাঃ! তাহলে এই বইদুটো পড়বে।
- আমি এখন ছোট বলে বাবা-মা আমাকে গল্পের বই পড়তে বারণ করেছে। বলেছে বড় হলে পড়তে পারবো।

- আচ্ছা, আমি বাবাকে বলে দেব। তাহলে আর বারণ করবে না। পড়া হয়ে গেলে বইয়ের গল্পগুলো আমাকে শোনাবে, কেমন?

এটা বলে উনি চলে গেলেন।

আমার কাছে গল্প শুনতে চাওয়া সেদিন সকালের মানুষটি ছিলেন কেষ্টবাবু, আমার প্রথম মাষ্টারমশায়।

দোকানদাদু

দোকানদাদু ছিলেন আমার দাদামশায়ের বাচ্চাবেলার বন্ধু। সেইসূত্রে দোকানদাদুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত। আমার মামাবাড়ির উল্টোদিকে ছিল ওনাদের পারিবারিক বেশ বড় এবং ঐ অঞ্চলের একমাত্র হার্ডওয়্যারের দোকান। পাথর খাদানের দেশ বলে সারাদিনের বিক্রিবাটা প্রচুর, সারাক্ষণ খদ্দেরে গিজ্‌গিজ্‌ করত। তখনকার দিনে, মানে প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগে ঐটুকু মফস্বল শহরে দোকানদাদু দোকান বন্ধ করতেন রাত সাড়ে নটার সময়। হার্ডওয়্যারের দোকান হলেও অ্যালুমিনিয়ামের থালা, পকেট চিরুনি, মার্গো সাবান, সানলাইট সাবান, ফরহান্স টুথপেস্ট, লক্ষ্মীবিলাস হেয়ার অয়েল থেকে শুরু করে পাথর ভাঙার জন্য বিশাল বিশাল সাইজের সব হাতুড়ি, গজাল, মোটা মোটা তারের জাল, লোহার হুক, অন্যান্য অনেক রকম সামগ্রী সবকিছু ওখানে পাওয়া যেত।

চেহারায় দোকানদাদু ছিলেন আমার দাদামশায়ের ঠিক উল্টো। লম্বায় আহামরি কিছু না হলেও বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা,

কাঁচাপাকা চুল পেছনদিকে টেনে আঁচড়ানো, পেল্লাই সাইজের একজোড়া হ্যাণ্ডেল-বার গোঁফ, গোলগোল একজোড়া সবসময়ের জলভর্তি চোখ আর নস্যি সিক্ত একজোড়া রক্ত-লাল নাসিকা ছিদ্র। ধুতির ওপর হাল্কা ঘি রঙের হাফহাতা বুশসার্ট যার দুদিকে দুটো বড় বড় বুকপকেট আর শীতের সময় গায়ে একটা খাদির শাল অথবা জামার ওপর একটা বাদামি রঙের হাফসোয়েটার পরে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। মানুষটির গলায় সিঁড়ির নীচ থেকে "দাদুভাই, দাদুভাই" ডাকের জন্য সকাল থেকে অপেক্ষা করে থাকতাম। কর্মচারীর হাতে দোকান খোলার চাবি দিয়ে উনি এসে একটা বয়েস পর্যন্ত আমাকে কোলে করে দোকানে নিয়ে যেতেন। রাস্তায় হাঁটতে দিতেন না। মামাবাড়িতে গেলে এটা ছিল আমার প্রতিদিনের রুটিন, সোমবার ছাড়া। সোমবার ছিল বাজারের সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

দোকানের কাউন্টারটি বেশ উঁচু। কাউণ্টারের ভেতরে সমানুপাতিক উচ্চতার একটা লম্বা চৌকি, তার ওপর রেক্সিনের কভার দেওয়া গদি আর গদির ওপর একটা মাদুর পাতা। সেখানে ছিল দোকানদাদুর আর আমার বসার জায়গা। চারদিকে লোহালক্কড় ছড়ানো থাকত বলে আমার চৌকি থেকে নামার পারমিশন ছিলো না। চৌকির একদিকে রাখা থাকত ক্যাশবাক্স, তার পেছনে একটা বালিশ। ঘুম পেলে দোকানদাদু ওখানেই টানটান হয়ে ঘুমিয়ে নিতেন, বিশেষকরে দুপুরগুলোতে।

মামাবাড়ি গেলে দোকানদাদু চৌকির ওপর বসিয়ে শিখিয়েছিলেন ছোটছোট পরিমাণের টাকাপয়সার যোগবিয়োগের অঙ্ক। শোনাতেন বিভিন্ন দেশের নানারকমের

গল্প। আর শিখিয়েছিলেন জ্যাক্ অ্যাণ্ড জিল্, হাম্‌টি ডাম্পটি, নোটন নোটন পায়রাগুলি, বাবুরাম সাপুড়ে এবং এরকম আরও বেশ কয়েকটা ছড়া এবং কবিতা। তবে আমার সবচেয়ে পছন্দের ছিল -

'আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি,
যদু মাষ্টার শ্বশুরবাড়ি।
রেল কাম ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম'।

০৫/০৪/২০২৬

****

শীতের আমেজ

আমরা মানুষেরা আমাদের প্রাকৃতিক প্রবণতা অনুসারে জীবনভোর দৌড়ঝাঁপ করি, যা পাই তা ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে জোগাড় করে হয় জমিয়ে রাখি অথবা জমিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

শেষমেষ কিন্তু দুটোমাত্র জিনিস আমরা যথার্থ অর্থে সঞ্চয় করে উঠতে পারি। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দুটো জিনিসই নিজের থেকে সঞ্চিত হয়, এগুলোর জন্য খাটাখাটনি বা দৌড়ঝাঁপ করা একেবারে অপ্রয়োজনীয়। প্রথমটি হচ্ছে আমাদের বয়স আর দ্বিতীয়টি হল আমাদের অভিজ্ঞতা। বয়স যেমন সময়ের সাথে পা ফেলে ফেলে আপনমনে বেড়ে চলে, অভিজ্ঞতা আবার সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় বয়সের ওপর। প্রথমটি বাড়লে দ্বিতীয়টি বাড়ে, আবার প্রথমটি যখন থেমে যায় অন্যটিকেও থেমে যেতে হয়। দুটোরই ব্যবহার আছে কিন্তু খরচ নেই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই যে এত বিশাল সংখ্যক অভিজ্ঞতা জমে যায়, তার মধ্যে অনেকগুলো এমন থাকে যেগুলো আমরা নিজের থেকে ভুলে যাই অথবা নানা কারণে ভুলে যেতে চেষ্টা করি । আবার কিছু অভিজ্ঞতা থাকে যেগুলো নিজেদের অজান্তে মনের আনাচে কানাচে থেকেই যায়; অনেকটা ঐ চিলেকোঠায় পড়ে থাকা জৌলুষহীণ, জরাজীর্ণ সিন্দুকের মত। কেউ কোনোদিন খুলে দেখার চেষ্টা করে না,

কোন কাজেও লাগে না, আবার ওটাকে ফেলে দেওয়াও হয়ে ওঠে না। তবে হাতে গোনা গুটিকয়েক এমন অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকে যেগুলো আমরা প্রায় সন্তানসম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখি, আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করি। এই রকম অল্পসংখ্যক অভিজ্ঞতা এতটাই নিজস্ব যে একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে সেগুলো ভাগাভাগি করে নিতে ইচ্ছে করে না। সেইরকম এক অভিজ্ঞতার গল্প আজ সবার কাছে রাখছি।

আজ থেকে অর্দ্ধশতাব্দী আগের শান্তিনিকেতনে এক ভোরবেলা। দিনকয়েক হলো পৌষ শেষ হয়েছে। সংক্রান্তি থেকে শুরু হওয়া একঘেয়ে একটা ঘ্যানঘ্যানে, টিপটিপ্ বৃষ্টি আগের দিন বিকেলের দিকে বন্ধ হয়েছে। তবে মেঘের সাথে মেশানো ঠান্ডা হাওয়ার অস্থিমজ্জায় ক্রমাগত টোকা দেওয়া বন্ধ হয় নি।

ঘটনার সূত্রপাত সেদিন ভোররাতে আমাদের হোষ্টেলের একটি ঘরে। ঘরটির আবাসিক ছিলাম আমি। সময়টা বলা যেতে পারে রাত তখন প্রায় শেষের দিকে, আবার ভোর সেইভাবে ঠিক শুরু হয়নি। রাত আর ভোরের সেই সন্ধিক্ষণে শুধু হোষ্টেল কেন, সারা শান্তিনিকেতন অতল ঘুমে নিঃঝুম। সেই সন্ধিক্ষণে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দরজায় ক্রমাগত দুমদাম ধাক্কার আওয়াজে। শরীর গরম রাখার সমস্ত আস্তরণের ভেতরে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল ঘুমের ঘোর কিছুটা হলেও পাতলা হতে। তারপর সামান্য ধাতস্থ হয়ে, অজানা সেই অতিথির চোদ্দপুরুষকে হোষ্টেলের প্রচলিত ভাষায় গালমন্দে ভূষিত করতে করতে, কোনোরকমে দরজা খুলেছিলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কিশোর। দেখে মনে হল যেন কোথাও একটা বেরনোর জন্য তৈরি। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কানে এল "রেডি হয়ে নীচে আয়, আমি নীচে গিয়ে

দাঁড়াচ্ছি"। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল "কিছু পয়সা নিয়ে নিস"। ঐভাবে ভেঙে যাওয়া কাঁচাঘুমে কি, কেন, কোথায় এসব জিজ্ঞেস করার কথা মাথাতে আসেনি। আর যদি আসতও, তাহলেও সেসবের কারণ জিজ্ঞেস করার প্রশ্ন ছিল না। হোষ্টেলের সেই কয়েকবছরের ছোট্ট জীবনে কিশোর আর আমি ছিলাম হরিহর আত্মা, হিন্দিতে যাকে বলে জিগড়ি দোস্ত। মাঘের ভোরের নৈসর্গিক আরামের সেই ঘুম ছেড়ে আমরা দুজন রওনা দিয়েছিলাম গাছ্-টাটকা খেজুর রস খেতে, খোয়াইয়ে।

হোষ্টেলের পেছ্নের গেট থেকে বেরিয়ে বাঁদিক দিকে গেলে প্রথমে আসত বৌদির দোকান - আমাদের কলেজ জীবনের চা, চপ এবং বন্ধুদের মিলনস্থল। তারপর অন্নদাশংকর রায়ের বাড়ির পাশ কাটিয়ে, পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালের সামনে দিয়ে গিয়ে বোলপুর - সিউড়ি বড় রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে ডানদিকে বড়জোর পাঁচশ মিটারের মধ্যে খোয়াই শুরু। মাঝে আসত ষ্টেট ব্যাঙ্ক, পোষ্টঅফিস, কোঅপারেটিভ ষ্টোর্স, রতনকুঠি গেষ্টহাউস, সবশেষে শ্যামবাটি। তারপর ক্যানাল পেরিয়ে শুরু হয়ে যেত খোয়াই।

শুরুর দিকে রাস্তার দুধারে বেশিরভাগই তালগাছ। কিছুটা গিয়ে তালগাছেদের সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিয়েছে খেজুর গাছেরা। ক্যানালের গা লাগোয়া ডানদিকের সাইকেল চলা রাস্তা চলে গেছে মাইলখানেক দূরে প্রান্তিক গ্রামে। সেখানকার ষ্টেশনের নামও প্রান্তিক। ক্যানালের গা লাগোয়া বাঁদিকের রাস্তা নিলে সোনাঝুরির শালবন পেরিযে পৌঁছে যাওয়া যায় শ্রীনিকেতন। আর ডানদিক, বাঁদিক কোনোদিকে না ঘুরে একদম সোজা মাইল দুয়েক গেলে আসে কোপাই নদী। আজকের কাহিনীর সেই ভোরে আমরা দুই বন্ধু খোয়াইয়ের

বুক চিরে লাল কাঁকড়ভরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছিলাম কোপাই নদীর দিকে। আমাদের ইচ্ছে খেজুর রস খেতে খেতে কোপাই নদী পযর্ন্ত যাব। তারপর একই রাস্তা দিয়ে ফিরে আসব। এখানে একটু বলে রাখি এই কোপাই নদীর মজা। শুধুমাত্র বর্ষাকালে তার মনে পড়ে যে সে একটি নদী। তাই ঐসময়টাতে হঠাৎ নিজের চড়া পড়ে যাওয়া আত্মসন্মান পুনরুদ্ধারে সে অতি মাত্রায় নদী হয়ে ওঠে। তখন আশপাশের গ্রামগুলোকে জলে চুবিয়ে মাসদুয়েকের জন্য সেখানকার জনমানুষের জীবন ব্যতিব্যস্ত এবং অতিষ্ঠ করে তোলে। যাই হোক, ভোরের খোয়াই দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে একজন লোককে দেখলাম রসভর্তি হাঁড়ি কোমরে বেঁধে খেজুর গাছ থেকে নেমে আসতে। আমরা সেই গাছটির গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে তক্ষুনি নামিয়ে আনা খেজুররস শালপাতার ঠোঙায় নিয়ে চুমুক দিয়েছিলাম। দুএক চুমুকে আমরা শেষ করি আর লোকটি সাথেসাথে আমাদের ঠোঙায় মশারির টুকরো দিয়ে মুখ বাঁধা হাঁড়ি থেকে আবার একটু একটু করে বরফ-ঠাণ্ডা রস ঢেলে দেয়। এক জায়গায় খাওয়া শেষে কিছুটা এগিযে যাওয়ার পর আরেকটা গাছের নীচে বসে আবার রস খাওয়া, সেই একই ভাবে, অন্য একজন লোকের নামিয়ে আনা হাঁড়ি থেকে অন্য গাছের রস। এইভাবে বার চারেক বোধহয় খেয়েছিলাম। সারারাত খোলা জায়গায় ফোঁটা ফোঁটা করে জমা হয় বলে গাছ থেকে সদ্য নামিয়ে রস অসম্ভবরকম ঠান্ডা হয। চোয়াল শক্ত করে দেওয়া সেই ঠাণ্ডা রসে মুখের ভেতরটা জমে পাথর হয়ে যায়। আমাদেরও হচ্ছিল।

খেজুররসে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়ে আমরা কোপাই নদীর পথে হাঁটা শুরু করেছিলাম। ঐ নদীতে আগে কয়েকবার গিয়েছি, তবে রাস্তা দিয়ে নয়, খোয়াইয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে অন্যান্য

দিক দিয়ে এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে। এই রাস্তা দিয়ে এবং এত ভোরে সেবারই প্রথম। আসলে দিন গড়ানোর সাথেসাথে খোয়াইয়ের চেহারাতেও সারাদিন ধরে পরিবর্তন আসতে থাকে। খেজুর রসের লোভের সাথে সাথে এই দিককার খোয়াইয়ের রঙ দেখার ইচ্ছেও আমাদের ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে দিন পরিষ্কার হয়ে উঠল। ছুটছাট কিছু সাইকেল, পায়ে হাঁটা কিছু কিছু মানুষ, বেশ কয়েকটি গরুর গাড়ি ইতিমধ্যে শহরের দিকে যেতে শুরু করেছে। রাতের শিশির শুকিয়ে খোয়াইয়ের রাস্তা ধুলো ওড়ানো শুরু করেছে। লাল ধুলোর হাল্কা আস্তরণ, কাঁকড়ের ওপর চলাফেরার কড়কড় আওয়াজ, গরুর গাড়ির চাকা থেকে ক্যাঁচর-ক্যাঁচর আওয়াজ, প্রথম আলোর সোনালী রঙ, সবকিছু মিলেমিশে মনে হচ্ছিল যেন কোনো শিল্পীর হাতে ধরা রঙের রঙদানি। আমাদের চটি, প্যাণ্টের হাঁটু পর্যন্ত সবকিছু লালে লাল। কিশোর কয়েকবার প্যাণ্ট থেকে থাবড়ে থাবড়ে ধুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে স্বগোতক্তি করেছিল "কিছু কিছু চেষ্টা খুব ইচ্ছে করলেও কক্ষনো করা উচিৎ নয়, বুঝলি"। কিশোরের এই এক অদ্ভূত অভ্যেস ছিল। কোনো কিছু অপছন্দ হলে অথবা মনের মতো না হলে এইরকম একটা করে দার্শনিক মন্তব্য বাজারে ছেড়ে দিত। অন্যেরা সেটা বুঝল কি বুঝল না, তার কিছু অর্থ হয় কি হয় না তা নিয়ে ও মাথা ঘামাত না।

কোপাই নদীর দিকে যাবার এই রাস্তা একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে যায়। গ্রামের নামও সম্ভবত ছিল কোপাই। অনেক বাড়ির মেয়েদের দেখলাম নিজেদের বাড়ির সামনের দালান ঝাঁট দিতে ব্যস্ত। কোনো পাকাবাড়ি দেখেছিলাম বলে আজ আর মনে পড়ে না। সবগুলোই বোধহয় মাটির তৈরি ছিল। তবে

কয়েকটি মাটির তৈরি দোতলা বাড়িও নজরে পড়েছিল। কয়েকজন বুড়ো রোদ-ন্যাতানো দালানে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে তাড়িয়ে তাড়িয়ে চা খাচ্ছিল, আর উপরি আরাম হিসেবে সেই গেলাসের মুখে মুখ ঝুঁকিযে গরম চাযের ভাপ নিচ্ছিল। সকালের ঐ পরিবেশে ধূমায়িত চা দেখে চা খাবার এক দুর্দমনীয় ইচ্ছে হয়েছিল আমাদের। অতটা হেঁটে খিদেও একটু পেয়েছিল।

গ্রামে ঢুকে লালমাটির রাস্তাটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, হুবহু ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মতো। বাঁদিকেরটা চলে যায় নদী পর্যন্ত। ডানদিকেরটার গন্তব্য জানি না, তবে মনে হয় ওটা ছিল গ্রামের ভেতরে যাবার রাস্তা। 'ভি' অক্ষরের ঠিক মুখটাতে দোতলা একটা মাটির বাড়ি। অন্যান্য বেশিরভাগ বাড়ির মত সামনে বেশ বড় তিনদিক খোলা দালান। দালান জুড়ে চপ মুড়ির দোকান। খরিদ্দার চাইলে গুড় দিয়ে চা বানিয়ে দেয়। দোকানটি সম্ভবত গ্রামের একমাত্র চপমুড়ির দোকান ছিল, তবে এতদিন পরে এখন আর অতটা নিশ্চিত নই। এটা মনে আছে সেদিন সেইমুহূর্তে দুই বন্ধু কোপাই নদীর দর্শন ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে, চায়ের লোভে সটান্ ঐ দোকানে ঢুকে পড়েছিলাম।

দোকানের একপাশে পাতা লম্বা দুটো কাঠের বেঞ্চি। রাস্তার দিকটায় একটা বড় উনুনের গনগনে আঁচে বসানো মস্ত এক কড়াই। কড়াইভর্তি টইটুম্বুর ছাঁকা সরষের তেলে ভাজা হচ্ছে আলুর চপ আর বেগুনি। বেশ বড় সাইজের আলুর চপ আর ইঞ্চি আটেক মাপের লম্বা লম্বা ফালি করে কাটা শীতের বেগুনের বেগুনি। অতবড় সাইজের চপ বা বেগুনি আগে কোনোদিন দেখিনি। মাঝারি চেহারার কাঁচাপাকা চুলওয়ালা, খাটো করে ধুতি আর জামা পরা মাঝবয়সী একজন লোক

কাঠের পিঁড়িতে উবু হয়ে বসে সেগুলো নিবিষ্টমনে ভাজছিল। গরম তেলে বুদ্‌বুদ্‌ ছড়ানো সেই বেগুনি আর চপ ছাঁকনা দিয়ে একটা একটা করে উল্টেপাল্টে পরম যত্নে সেগুলোতে হাল্কা বাদামি রং আনছিল। খুব মনযোগ দিয়ে আমরা লোকটির ভাজার কায়দা লক্ষ্য করছিলাম। কড়াই থেকে ভেসে আসা ম ম গন্ধ আমার সবকটা ইন্দ্রিয়ের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। কনুইয়ের আলতো খোঁচা দিয়ে কিশোর ইশারা করল লোকটির মুখের দিকে। নজরে পড়ল ঠোঁটের বাঁদিকের কোণে ঝুলিয়ে রাখা বিড়িটা। ঠোঁট দিয়ে ধরে থাকা বিড়িতে টান দিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করছিল। ঐ অবস্থাতে আবার দু-একবার খুকখুক করে কাশ্‌লো। শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিড়িটা বাঁ হাতের দু আঙ্গুল দিয়ে ধরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে পাশে রাখা ছোট একটা পেতলের ঘটির জলে আলগোছে ঠিক ঐ দুটো আঙ্গুল ধুয়ে নিল। ভাজা হয়ে গেলে উনুনের পাশে রাখা দুটো বিয়েবাড়ির মত বড় বড় কাঠের পরাতে কড়াই থেকে তুলে চপ আর বেগুনিগুলো রাখছিল। লোকটির পেছনদিকে তিনটে বিশাল বিশাল ধামায় চুড় করে রাখা ছিল মুড়ি। বুড়োর থেকে সামান্য দূরে বসে হাতখানেক ঘোমটা মাথায় একটি অল্পবয়সী মেয়ে একমনে গোল গোল করে ফালি আলুর চপ গড়ছিল আর বেগুনগুলো লম্বা লম্বা ফালি করে কেটে সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল। খদ্দেরদের মধ্যে কেউ চা চাইলে সামনে রাখা ছোট একটা তোলা উনুনে স্যাসপ্যান্‌ বসিয়ে গুড় দিয়ে চা তৈরি করে দিচ্ছিল। আগে কোনদিন খায় নি বলে গুড়ের চা নিয়ে কিশোর একটু সন্দিগ্ধ ছিল। চিনি দেওয়া চা পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করাতে আমাদের পাশে বসা লোকগুলোর অবাক হওয়া চাউনি খুব মনে পড়ে। মুরুব্বি চেহারার একজন চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল 'চিনি বড় মাঙনা গো দাদারা'।

বেশ মনে আছে বেঞ্চিতে বসে আমরা চা খেয়েছিলাম নবাবি ঢঙে, অনেকক্ষণ ধরে তাড়িয়ে তাড়িয়ে, ধোঁয়া ওঠা গুড়ের চায়ের সঙ্গে শীতের নির্যাসটুকু মিলিয়ে মিশিয়ে। অনেকক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার চা নিয়েছিলাম। মাঝের সময়টুকু কেটেছিল শালপাতার ঠোঙায় মুড়ি, দুটো করে আলুর চপ আর বেগুনি খেতে খেতে। টাক্‌না হিসেবে দিয়েছিল এক টুকরো করে খেজুর গুড়ের পাটালি।

বছর পঞ্চাশ আগেকার এক মাঘ-সকালের ঐরকম এক পরিবেশে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কোপাই গাঁয়ের দোকানে বসে চপ, বেগুনি, মুড়ি আর গুড়ের চায়ের সবমেশানো মন কেমন করা গন্ধটা আজও কখনোসখনো নাকের সামনে দিয়ে আচমকা হাল্কা হয়ে ভেসে যায়। সেদিনকার সবকিছু ছিল আলাদা। ঠাণ্ডার কনকনানি, খোয়াই, পায়ে জড়ানো লাল ধুলো, কাঁকড়ের মড়ড়্ মড়ড়্ আওয়াজ, প্রকৃতি, পরিবেশ, খেজুর রসের গন্ধ, সবকিছু আলাদা ছিল। পরিপূরক হিসেবে ছিল আমাদের বয়স, আমাদের মন, আমাদের মেজাজ, আমাদের সখ্যতা। সেই রঙ এবং গন্ধের বর্ণনা কাগজের ওপর কলম দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে আমি অপারগ। তাই সান্ত্বনা খুঁজি কিশোরের দর্শনে "কিছু কিছু চেষ্টা, খুব ইচ্ছে করলেও কক্ষনো করা উচিৎ নয়, বুঝলি"!

০৬/১২/২০২৩

*****

রাবণ

বাড়িতে, রাস্তায় বা দোকান বাজারে চলাফেরা করার সময় কোনো না কোনো কারণে আমরা অনেকসময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। এরকম অবস্থায় সাধারণত সম্পর্কহীন কিছু ঘটনা অথবা কিছু মানুষ অথবা যেকোনো ধরণের কোনোকিছু মাথার মধ্যে হঠাৎ ঘুরপাক খেতে শুরু করে এবং আমরা অজান্তেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। এই অন্যমনস্কতার কারণে চলাফেরার সময় যখন-তখন আমরা হোঁচট খাই, আবার কখনো ধাক্কাও খেতে হয়। আমার অভিজ্ঞতায় এই ক্ষণেকের হোঁচটগুলি অতীত জীবনের অংশ অথবা ভবিষ্যতের কল্পনাকে আচমকা সামনে এনে সম্পূর্ণ নতুন পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোর মূল্যায়নে সাহায্য করে। আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিলাম সবুজ আলোর অপেক্ষায়। গাড়ির ভেতর অপেক্ষারত আমি, গাড়ির ভেতর বসে থাকা অবস্থাতেই এইরকম একটি হোঁচট খেলাম। সামনাসামনি পড়ে গেলাম অতীতের একটুকরো সন্ধ্যার।

কথা নেই বার্তা নেই আচমকা রাবণের কথা মনে পড়ল, অথচ সেই মূহূর্তে রাবণকে মনে পড়ার কোনো কারণ ছিল না। অস্বীকার করে লাভ নেই বিগত পঁচিশ তিরিশ বছরে রাবণের কথা আমার একবারের জন্যেও মনে পড়েনি।

রাবণ ছিল আমার মামাবাড়ির ম্যান-ফ্রাইডে, গোদা বাংলায় যাকে বলে বিশ্বস্ত সহকারী যাকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায়।

বড়জোর পাঁচ ফিট মতন উচ্চতা, চওড়া পেশিবহুল গড়ন, মাথার সামনের দিকে টাক, পরনে ঋতু বিশেষে হাঁটু অথবা গোড়ালি অব্দি লুঙ্গি আর স্যাণ্ডো অথবা হাফহাতা গেঞ্জি, হাতে সর্বক্ষণের সঙ্গী একটা হাতুড়ি আর একটা স্ক্রু ড্রাইভার। ভাঁড়ার ঘরে নেংটি ইঁদুর ঢুকলে রাবণের ডাক পড়ত, লাইটের ফিউজ উড়ে গেছে - রাবণকে ডাক, রান্নাঘরে নালি দিয়ে জল যাচ্ছে না তো রাবণকে ডাক। কুঁয়োর মধ্যে দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে বালতি পড়ে গেছে। জল তোলা যাচ্ছে না বলে বাড়িতে জলের সংকট, রাবণ এলে তবেই জল আসবে। অতএব রাবণকে ডাক। বাড়ির পুরুষদের কাছে বাড়িতে জল আছে কি নেই সেটা বড় কথা ছিল না, রাবণকে ডাকা হয়েছে কিনা সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক বিকেলে চিঠি এলো ছেলের বাড়ি থেকে পরেরদিন বিকেল আড়াইটের ট্রেনে বোনকে দেখতে আসবে। বাড়িতে পারিবারিক অথবা বিশিষ্ট অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বরাদ্দ একটাই জায়গা - দোতলার বারান্দা। অতিথি সৎকার ছাড়াও বারান্দাটির ছিল আরও অগুনতি উপযোগিতা। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একটু হাওয়ার আশায় মাদুরে শুয়ে গড়াগড়ি, শীতের দুপুরে কম্বলের ওপর এবং কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে রোদে পোয়ানো, বিয়ে, নান্দিমুখ, সকালে প্রথম আর দ্বিতীয় কাপ চায়ের সঙ্গে দিনশুরুর একটানা আড্ডা, অতি ঘনিষ্ঠদের নিয়ে সন্ধ্যের মজলিসি আড্ডা, জনা পঞ্চাশেক নিমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি এবং অন্যান্য অনেককিছু। হারিকেনের ছেলের বাবার চিঠিটা পড়ে গৃহস্বামী নিদান দিলেন "বারান্দার যা চেহারা হয়েছে তাতে কোনো ভদ্রলোককে বসানো যাবে না"। এই বলে তিনি তাঁর প্রাত্যাহিক সান্ধভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। জরুরি পরিস্থিতিতে ঠিক হলো পরেরদিনের প্রস্তুতি হিসেবে দোতলার বারান্দা আজকেই দু'ঘণ্টার মধ্যে চুনকাম করাতে হবে। অতএব রাবণকে ডাকা

হল এবং রাবণ ঐ সন্ধ্যেতেই লোডশেডিংয়ের দৌলতে হ্যারিকেনের আলোয় চুনকাম করেও দিল। রাবণের সঙ্গে আমার ব্যাক্তিগত সম্পর্কের কথাই বলি। বড় হওয়ার মাপদণ্ড হিসেবে সদ্য লুকিয়ে সিগারেট খেতে ধরেছি। একজন বিশ্বস্ত লোককে দরকার দোকান থেকে কাউকে না জানিয়ে সিগারেট কিনে আনার জন্য। অতএব আমারও সেই 'রাবণকে ডাক', অবশ্যই লুকিয়ে। আজপর্যন্ত দোকানদার জানে না রাবণ কার জন্য সিগারেট কিনে নিয়ে যেত।

যাক্‌গে, ভূমিকা ছেড়ে এখন গল্পের কথায় ফিরে আসি। একদিন সন্ধ্যেবেলা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছি। বুঝতে পারলাম বাড়ির আবহাওয়া একটু থমথমে। গিন্নিমা এবং তাঁর মেয়ে - দুজনকেই বেশ উত্তেজিত মনে হল। কিছু বুঝতে উঠতে পারছি না। ওদের দুজনের মধ্যেকার একটা কথা শুধু কানে এলো "আজকাল তো তাহলে ভগবানকে বিশ্বাস করাও মুশকিল হয়ে যাচ্ছে"। এটা শুনে এইটুকু অন্তত বোঝা গেল যে ব্যপারই ঘটে থাকুক না কেন সেটা বেশ সিরিয়াস ধরনের। অল্পক্ষণের মধ্যে আসল ঘটনা সামনে এলো।

একতলায় রান্নাঘরের লাগোয়া ছোটমতন একটা ঘর আছে। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে সেখানে যেতে হয়। ভেতরের দিকে হওয়ার কারণে ঘরটা গরমকালে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা থাকত। তাই গরমের সময় মাঝেমধ্যেই ঐ ঘরটা দুপুরের খাওয়াদাওয়ার জায়গা ছিল। একটা দেওয়ালের ওপরদিকে টানা লম্বা কাঠের তাক। তার এক কোণায় চিরকাল দেখেছি একটা মাটির কলসি রাখা থাকত। কোনোদিন কাউকে সেটা নীচে নামিয়ে আনতে দেখিনি। শোনা যেত সেই কলসিতে নাকি ভর্তি পাকা তেঁতুল ছিল এবং আরও অনেক

জিনিসপত্রের সঙ্গে তেঁতুলভর্তি কলসিটি নাকি এসেছিল আমার প্রমাতামহের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে। কলসির সেই গল্পটি অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করলেও বংশপরম্পরায় মুখেমুখে চলে আসা এই ইতিহাস মেনে নিতে হয়। জিনিসপত্র বলতে ঘরটিতে একটা তারের জালি দেওয়া মিটসেফ ছাড়া আরকিছু ছিল না। মিটসেফের ভেতর রাখা থাকত রান্না করার প্রয়োজনীয় কিছু ছোটছোট বাসনপত্র। বর্ষার সেই থমথমে সন্ধ্যেয় মিটসেফের ভেতর রাখা একটা কাঁসার ঘটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আগেরদিন বিকেলে রাবণকে ঐ ঘরে পাঠানো হয়েছিল চামচিকে বার করতে। ও কাজ করে বেরিয়ে যাবার পর থেকে ঐ ঘরে আর কেউ ঢোকেনি। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্দেহের তীর রাবণের দিকেই অবধারিতভাবে ঘুরে যাচ্ছিল। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে ঠিক হলো রাবণকে ডেকে পাঠানো হবে ব্যপারটার হেস্তনেস্ত করবার জন্য। রিক্সাওয়ালা পতিত গেল রাবণকে ওর বাড়ি থেকে ডেকে আনতে। পতিতের বউ এপাড়াতেই অন্য কয়েকটা বাড়িতে ঠিকের কাজ করে, আর আমাদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে এসে ফাইফরমাস খেটে দেয়। সেই অর্থে পতিত মোটামুটি একজন ভরসার লোক। ভরসার সন্মান রেখে পতিত কিছুক্ষণের মধ্যে রাবণকে নিয়ে এলো।

দোতলার বারান্দা। একদিকে গিন্নিমা আর তাঁর মেয়ে, অন্যদিকে একটু ভ্যাবাচ্যাকা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রাবণ। রাবণের পেছনে পতিত দাঁড়িয়ে ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি নিয়ে। বারান্দার দুপ্রান্তের ছাদের বিম্ থেকে ঝুলছে দুটো ষাট পাওয়ারের হলদেটে আলো। লোডশেডিঙের দৌরাত্ম সামলানোর জন্য এক কোণে রাখা আছে একটি সলতে কমানো জ্বলন্ত হ্যারিকেন।

মেয়ে চেয়ারে বসে, হাতে একটা চিরুনি। অতি গম্ভীর পরিস্থিতি হলে ওনার হাতে সবসময় একটা চিরুনি থাকত। নিজে চেয়ারে বসতে পছন্দ করতেন না বলে গিন্নিমা ওনার ঘরের দরজা লাগোয়া দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মাটিতে বসে আছেন। গিন্নিমা একাই কিছুক্ষণধরে একটানা দোষারোপ করার পরে রাবণকে অভিযুক্ত ঘোষণা করে দিলেন। মাঝখানে রাবণ দু-একবার মিনমিন করে নিজের পক্ষে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মুখ খোলার সুযোগই পায়নি। মিনিট পনেরোর মধ্যে গিন্নিমা ঘটি চুরির দায়ে রাবণের শাস্তি ঘোষণা করলেন - "হারামজাদা! তুই, তোর বংশের কেউ আর কোনদিন এবাড়ির ছায়া মাড়াবি না। যদি কোনোদিন এই চত্ত্বরে দেখতে পাই তাহলে উকিলবাবুকে বলে থানায় দিয়ে দেব। সারাজীবন জেলের ঘানি টেনে মরবি"। তৈরি হয়ে আসা সত্ত্বেও ঘটনার এত দ্রুত পরিসমাপ্তিতে মেয়ে মুখ খোলার কোনো সুযোগই পেল না।

এরপর বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। রাবণকে এবাড়িতে আর দেখা যায় না। রান্নাঘরের নালি দিয়ে ঠিকমতো জল বার হচ্ছে না। চামচিকেরা অবাধে বংশবৃদ্ধি করছে আর তাদের দৌরাত্মিতে সন্ধ্যের পর রান্নাঘরের দিকে প্রায় যাওয়াই যাচ্ছে না। ফিউজ উড়ে গেলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির জন্য হাপিত্যেস করে বসে থাকতে হচ্ছে। কত্তামশায়ের জল খাবার কাঁসার গেলাস কবে থেকে কুঁয়োর ভেতর পড়ে আছে। অন্য গেলাসে জল খেয়ে ওনার তৃপ্তি হচ্ছে না। এইধরনের এত পুরনো, সমস্যা জর্জরিত বাড়িগুলোতে রাবণদের ছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা খুব আরামদায়ক তো হয় না, হবার কথাও নয়, হচ্ছিলও না।

একদিন ভর দুপুরবেলা আমি পোস্টঅফিস থেকে বাড়ির ফিরছিলাম। রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ দেখতে পেলাম তিনতলার জলের ট্যাংকের ওপর রাবণ বসে আছে। এক হাতে ধরা আছে একটা লম্বা লাঠি। অন্য হাত দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে আর ফুকফুক করে চারদিক দেখতে দেখতে ধোঁয়া ছাড়ছে। ভাবখানা এমন যেন ও নিজের বাড়ির ছাদে বসে আছে। প্রথমত রাবণকে দেখে আর দ্বিতীয়ত রাবণকে আমাদের বাড়িতে নিশ্চিন্তে বসে বসে বিড়ি খেতে দেখে বেশ খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই ব্যপারটা পরিষ্কার হলো। সারা বাড়ির সকলের সাথে গিন্নিমা যোগাযোগ রাখতেন রান্নাঘরের উঠোনের দিকের যে দরজা তার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে। কানে এলো গিন্নিমার একতলা থেকে চিৎকার ...."হারামজাদা সকাল থেকে নখের যুগ্যি এইটুকু একটা পাখি বার করতে পারিস না, এদিকে যে দুকুর হয়ে গেল" (উনি 'দুপুর'কে দুকুর বলতেন)'। বুঝতে পারলাম জলের ট্যাঙ্কে পাখি পড়ে গেছে। চিৎকার সমানে চলছে - "যত্তো রাজ্যের অকম্মার ঢেঁকি বাঁদরগুলো সব আমার কপালেই এসে জোটে। শালিক বার করে তোর আর কাজ নেই, তুই এক্ষুনি নেমে আয়। ভাত কটা যে জল হলো।"

তাই ভাবছিলাম মাঝেমধ্যে হোঁচট খাওয়া ভালোই।

০৩/১১/২০১৫

*****

গুপ্তিপাড়া

শেষবার যখন আমরা পূজোতে গিয়েছিলাম তখন আমি ক্লাস টু-তে পড়ি। তখন 'স্ট্যান্ডার্ড টু' বলে কিছু হত না, তাই ক্লাস টু বললাম। সালটা ১৯৬৪। কালনা থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল অর্থাৎ এখনকার প্রচলনে নয় কিলোমিটারের মত দূরত্বে আমাদের গন্তব্য। পেট্রোলে চলা ডজ্ বাস সময় নিত মিনিট চল্লিশ। সেই বাস আবার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে স্টার্ট করতে হত। গঙ্গার ওপর আমাদের বড় গ্রাম। রেলস্টেশন থাকলেও স্টেশনের কাছাকাছি ছাড়া গ্রামের ভেতরে গাড়ি চলার রাস্তা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হাঁটা অথবা গরুর গাড়ি ছিল চলাচলের উপায়। কালনা-বলাগড় রুটের বাস মেন্ রাস্তার ওপর গ্রামের স্টপেজে আমাদের নামিয়ে দিত। এস্টেটের ম্যনেজার ছিলেন শ্রীমন্তকাকা, বাবা-কাকাদের বন্ধু। বাসস্টপে আসতেন দুজন মুটেকে সঙ্গে নিয়ে। একজন মাথায় করে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যেত। দ্বিতীয়জন দরকারে সবচেয়ে ছোটবোনকে কোলে করে নিয়ে যেত। বাক্সপ্যাঁটরা বলতে সেই যুগের বেল্ট লাগানো একটা অথবা দুটো সৌখিন চামড়ার স্যুটকেশ আর একটা বেশ বড় সাইজের বেতের বাস্কেট বা ঝুড়ি। এখনকার কিটব্যাগ আর তখনকার বেতের ঝুড়ি উপযোগিতার দিক থেকে নিশ্চিতভাবে সমগোত্রীয়। এই দুটো জিনিসের মধ্যে অর্দ্ধশতকের তফাত থাকলেও যাত্রার সময় একইরকম জিনিস বহন করে। সবকিছু মুটের মাথায় চড়িয়ে

আমরা রওনা দিতাম ছুতোরপাড়ায় আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়ির নাম 'সিদ্ধান্তবাড়ি'। মিনিট তিরিশের হাঁটাপথ পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে। যেকোন দিকে তাকালে শুধু বড়বড় গাছ। বেশিরভাগই আম, কাঁঠাল, নিম আর অশ্বত্থ। ফাঁকফোকর দিয়ে কয়েকটা তাল আর নারকেল গাছ দেখা যায়। নীচটা ঝোপঝাড়ে ভরা। সেখানে আবার প্রচুর বিচুটি গাছ আর লজ্জাবতী লতা। বড় গাছগুলোতে যত না পাতা তার চেয়ে বেশি হনুমান। এসবের মাঝ দিয়ে রোদ-না-পৌঁছনো পায়ে চলা সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়াটা আমাদের ভাই-বোনের খুব প্রিয় ছিলো। তবে শ্রীমন্তকাকার নজর এড়িয়ে এদিক ওদিক করার উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর শুনতে পেতাম এদিকে যাবে না, ওদিকে যাবে না। শ্রীমন্তকাকাই আমাদের চিনিয়েছিল লজ্জাবতী গাছ। নিজের হাতে আমাদের আঙুল ধরে সেই গাছের পাতাগুলো ছুঁইয়ে দেখিয়েছিল সেই গাছের লজ্জা পাওয়া। এই বয়সে এসেও কোথাও লজ্জাবতী গাছ দেখলে তাকে না ছুঁয়ে পারি না। আমার স্পর্শে লজ্জায় তার কুঁকড়ে যাওয়াটা আমি দেখতে পাই না। সেই জায়গায় আমি শ্রীমন্তকাকাকে দেখতে পাই। চেঁচামিচি শুরু করে দিত যদি কাছাকাছির মধ্যে বিছুটি গাছ নজরে পড়ত। আমাদের দুজনের হাত নিজের দুহাতে চেপে ধরে জোরে জোরে হেঁটে সেই জায়গাটা পার করে দিত। একবার ঐরকম হাঁটতে হাঁটতে প্রথম ল্যাজ কাটা হনুমানটা দেখি। শ্রীমন্তকাকার হাতে নিশ্চিন্তে আমাদের সমর্পণ করে বাবাকে দেখতাম খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে আমাদের অনেক আগে বাড়ি পৌঁছে গেছে। বোঝার বয়স হয়নি বলে তখন বুঝতাম না, এখন বুঝতে পারি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাওয়ার কারণ নিশ্চয় ছিল ভিটের টান।

গ্রামের নাম গুপ্তিপাড়া। জেলা হুগলী। উনিশশো চৌষট্টিতে আমাদের নয় পুরুষের আদি বাড়ি, ছয় বা সাত পুরুষের পুরনো বাড়ির পুজো।

সিদ্ধান্তবাড়ির পুজোর কতকগুলো অলিখিত নিয়ম ছিল। আজকের কথা যে সময়ের, তখন গৃহস্বামী ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। ভীষণ ব্যাক্তিত্বে ভরা গাম্ভীর্যপূর্ণ সম্ভ্রান্ত বনেদি চেহারা। একবার কিছু বলে দিলে সেটা হয়ে যেত পারিবারিক নিয়ম। সেই নিয়মগুলো কেউ কোনোদিন অমান্য করেছে অথবা উপেক্ষা করেছে বলে শোনা যায়নি, কোনোটা আবার পছন্দ না হলে অসন্তোষ প্রকাশের কথাও কখনো শোনা যায়নি। মহাষষ্ঠীর সকালে গর্ভমন্দিরের দরজার ঠিক বাইরে ঠাকুরদালানে রাখা একটা কাঠের চেয়ারে এসে বসতেন। মাঝের খাওয়া শোয়ার সময়টুকু ছাড়া সেই চেয়ার থেকে উঠতেন দশমীর দিন গর্ভমন্দিরের বেদী থেকে প্রতিমা উত্তোলনের ঠিক আগে। পুজোর দিনগুলোয় ঠাকুরের ভোগ দিয়ে খাওয়া সারতেন ওখানেই। একপাশে থাকত তক্তপোষের ওপর পাতা বিছানা। দুপুর এবং রাতের বিশ্রাম সেখানেই। বিশ্রামের সময় ছাড়া চেয়ার ছেড়ে উঠতেন না। পুজোর পাঁচটা দিন ওনাকে কেউ কোনো আদেশ বা নির্দেশ দিতে শোনেনি, কাউকে বকাঝকা করতে দেখেনি, কারোর ওপর রাগারাগি করতে দেখেনি, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেনি। শুধু কদাচিৎ কাউকে, সে বাড়ীর অথবা পাড়ার বাচ্চা থেকে বুড়ো যে কেউ হোক না কেন, হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিতেন। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করতেন ‘কিছু খেয়েছিস’?

নামে সিদ্ধান্তবাড়ির পুজো হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল ছুতোরপাড়ার বাসিন্দাদের প্রত্যেকের বাড়ির পুজো। পাড়ার প্রতিটি পরিবারই ছিল খেটে খাওয়া মানুষদের পরিবার, এককথায় গরিব মানুষদের পরিবার। তাই পুজোর দিনগুলোয় সিদ্ধান্তবাড়িতে যা যা নিয়মের পালন হত, পাড়ার প্রত্যেক বাড়ি সে একই নিয়ম পালন করত। কোথাও কোনোরকম ঊনিশ-বিশ করার উপায় ছিল না। বাড়ির আর পাড়ার মেয়েদের জন্যে আসত একরকম শাড়ি, ছেলেদের জন্যে কেনা হত একরকম ধুতি আর জামার কাপড়, সমস্ত বাচ্চাদের জন্য আনা হত এক ধরণের জামাকাপড়। পরে জেনেছিলাম এতসব এক রকমের জামাকাপড় আনা হত কলকাতার কমলালয় ষ্টোর্স থেকে আর আসত ভাগলপুর থেকে। নিয়ম ছিল সেগুলো বাড়িতে এসে কেউ নিয়ে যাবে না, সিদ্ধান্ত বাড়ির প্রত্যকেটি ছেলে এবং পুরুষ সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতুন জামাকাপড় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত পাড়ার সকালের জলখাবার আর দুপুরের খাওয়া আমাদের বাড়িতে হত। অত্যন্ত সাধারণ ব্যবস্থা। জলখাবারে মুড়ি, সর্ষের তেল, আখের গুড় আর নারকোল নাড়ু অথবা গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত মাখাসন্দেশ। যতদূর মনে পড়ে অষ্টমীর দিন বোধহয় লুচি, আলুর তরকারি হত। দুপুরে আতপচালের ভাত, ঘি, ডাল, একটা ছ্যাঁচড়া জাতীয় কিছু আর একটা তরকারি। নিয়ম ছিল পুরো রান্না বাড়ির মেয়েদের করতে হবে এবং তারাই পরিবেশন করব। তাই হতো। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে হতে পুজোদালানে হ্যাজাক আর গ্যাসলাইট, বাড়ির ভেতর লন্ঠনগুলো জ্বলে উঠত, কোনো কোনোদিন ঠাকুর্দা ভেতর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে তাড়া দিতেন সন্ধ্যারতির সময এগিয়ে আসছে বলে।

অষ্টমীর সন্ধ্যেয় ঠাকুরদালানের সামনের ছোট মাঠটায় যাত্রা হতো। সময় বরাদ্দ ছিল এক ঘণ্টা। আরতির পর শুরু হয়ে, কাহিনী শেষ হোক বা নাহোক, নটার সময় শেষ। নিয়ম ছিল বাড়ির ছোটদের যাত্রা শুরুর আগে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। এই নিয়মটা থেকে একটু ছাড় পাবার জন্য অষ্টমীর সকাল থেকে সারাদিন আমরা ঠাকুমাদের পেছন পেছন ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করে বেড়াতাম। লাভ হতো না। কারণ নিয়মের বেড়াজালে তাঁরাও বাঁধা ছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যারতির শেষে, যাত্রা শুরুর হওয়ার ঠিক আগে ঠাকুর্দা প্রত্যেকটি ঘর ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি বাচ্চার হিসেব নিতেন, দেখতেন ঘুমিছে কিনা। পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলে তবেই যাত্রা শুরু করার অনুমতি দিতেন।

নিয়ম ছিল বিসর্জনের ঠাকুর বাড়ির ছেলেদের কাঁধে চেপে গুপ্তিপাড়ার গঙ্গায় যাবে। চিরকাল ঠাকুর সেভাবেই যেতেন। সেবার বিসর্জনের দিন সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাবা, কাকা, জেঠুরা সবাই স্নান করে ধবদবে সাদা ধুতি আর গেঞ্জি পরে তৈরি। একটুখানির জন্য বাবাকে আলাদা পেয়েছিলাম। খুব নীচুস্বরে আব্দার করেছিলাম 'আমিও যাব' বলে। বাবার মুখের অভিব্যক্তিটা আজ এই চুয়ান্ন বছর পরেও আমার পরিষ্কার মনে আছে। ছোট বয়সে সেই অভিব্যক্তির ভাষা বুঝতে পারিনি, আজ পরিণত বয়েসে হয়তো সেটা হয়তো পারি। বাবার সেদিনের টানাপোড়নটা সম্ভবত ছিল পিতৃস্নেহ আর পিতৃআজ্ঞার মধ্যেকার টানাপোড়ন। কারণ, নিয়ম ছিল বাচ্চারা এবং মেয়েরা বিসর্জনে গঙ্গার ধারে যেতে পারবে না।

এতোসব নিয়মের মধ্যে যে নিয়মটার কথা বলে এই লেখা শেষ করবো সেটা আমার কাছে পরিবারের একজন তার কর্তার

নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নিয়মটা ছিল প্রত্যেক বছর পুজোর সময় পরিবারের প্রত্যেককে, তা সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, অন্ততঃ দুদিনের জন্য হলেও গুপ্তিপাড়া আসতে হবে।

যেহেতু ঠাকুর্দা পুজোর দিনগুলো পুজোদালানেই থাকতেন, ভেতর বাড়িতে পাঁচ দিন ধরে চলত বাবা, কাকা, মা, কাকী, জেঠু, জেঠিমাদের বল্গাহীন, অবারিত, অন্তহীন আড্ডা আর হুল্লোড়। সেইসব নিয়মের ফল আজও দেখতে পাই, অনুভব করি। উনিশশো চৌষট্টির সেই বাচ্চাগুলো আজকে পরিণত, যুবা এবং মধ্যবয়সীরা আজ বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ বা গতায়ু। যারা আছেন তাদের সবার জন্য তখনকার বজ্রআঁটুনি নিয়মগুলো আজ পরিণত হয়েছে নির্ভেজাল এক আকাঙ্ক্ষায়। এরা প্রত্যেকে যেভাবে হোক, যেমন করে হোক দুর্গাপুজোর সেই চারটে দিন ফিরে পেতে চায়, এবং গুপ্তিপাড়াতেই।

২৯/০৯/২০১৮

*****

অজিতদা, অনিলদা

ছাত্রজীবনের সম্পূর্ণ দ্বিতীয়ভাগটি আমি কাটিয়েছি হোস্টেলে। একটানা দশ বছর। তার মধ্যে শেষ পাঁচবছর একই কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই হোস্টেলে। পাঁচটা ব্লক নিয়ে দোতলা হোস্টেল। প্রথম চারটে ছিল পুরনো ব্লক। প্রথম ব্লকে কুড়িটা রুম নিয়ে একটি উইং। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্লকের প্রতিটিতে দুদিকে দুটো করে মোট ছয়টি উইং এবং এই তিনটি ব্লকে মোট একশ কুড়িটা রুম। অপেক্ষাকৃত নতুন তৈরি পঞ্চমটিতে ছিলো একটি উইং, চোদ্দটি রুম। পুরো হোস্টেলে রুমের সংখ্যা সাকুল্যে একশ চুয়ান্ন। আমি থাকতাম পঞ্চম ব্লকের দোতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথম রুমে। রুমটি ছিল ডাবল অকুপেন্সির জন্য বরাদ্দ, অর্থাৎ দুজনের থাকার জন্য। গ্র্যাজুয়েশনের তিন বছর ঐ রুমেই কেটেছে। পোস্টগ্র্যাজুয়েশনের দুবছর কেটেছে থার্ড ব্লকের দোতলায় একটি সিঙ্গল রুমে।

হোস্টেলের রুমের বিন্যাস নিয়ে এতো কথা না বললে তখনকার দিনে রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কাজের চাপ এবং মানসিকতা, এখনকার ভাষায় যাকে আমরা বলি ওয়ার্কলোড রিলেটেড ইস্যুজ্, কিরকম হত সেটা বোঝা বা বোঝানো সম্ভবপর হবে না।

আমাদের কলেজে ক্লাসের সময় ছিলো সকালবেলা। বেলা একটা নাগাদ চারদিক শুনশান্। শীতকালে ক্লাস আরম্ভের

সময় সকাল সাতটায় আর গ্রীষ্মের সময় সাড়েছটায়। আমরা আবাসিকরা ঋতুবিশেষে ছটা থেকে সাড়েছটার মধ্যে ক্লাস করতে বেরিয়ে যেতাম। একশ চুয়ান্নটি রুমের জন্য চারটে টাইম-কল ছিলো। প্রতিদিন সকালবেলায় একঘন্টার জন্য টাইম-কলে খাবার জল আসত, ঠিক আমাদের বেরিয়ে যাবার সময়। প্রতিটি রুমে একটি করে জলের কুঁজো আমরা রাখতাম। সবমিলিয়ে একশ চুয়ান্নটি কুঁজো।

পুরো হোস্টেলের দায়িত্বে ছিলো দুই স্যুইপার - অজিতদা আর অনিলদা। এক একজনের ভাগে সহজ হিসেবে পঁচাত্তর থেকে আশিটি করে রুম। দৈনন্দিন কাজ - প্রতিটি রুম ঝাঁট দেওয়া এবং প্রতিটি কুঁজোতে প্রত্যেকদিন টাইম-কল থেকে খাবার জল ভরে আনা। বুধবার ছিলো কলেজের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সেদিনের অতিরিক্ত কাজ হত প্রতিটি রুম মুছে দেওয়া। ওদের ছুটির দিন ছিল রবিবার।

আমার পুরো কলেজ জীবন কেটেছে অজিতদার হাতে জল খেয়ে। ওদের দুজনের মধ্যে একজন কোন কারণে না এলে অন্যজনকেই পুরোটা সামলাতে হতো, সামলে দিতোও। শুধু সময়ের ঈল্পতার জন্য কয়েকজনকে রুমের চাবি ওদের দিয়ে যেতে হত। আমার পাঁচ বছরের আবাসকালে দুজনের কারোরই অনুপস্থিতি বোধহয় মোটামুটি দশ-পনেরো দিনের বেশি হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

দুজনের মধ্যে অজিতদার চেহারা ছিল থলেথলে। আমার মনে অজিতদার একটাই ছবি আছে। খাকি রঙের ঢোলা হাফপ্যান্ট পরা, খালি পা, উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গে জড়ানো পৈতে, ঠোঁটের বাঁদিকের কোণা থেকে ঝুলতে থাকা অর্ধেক নিভে যাওয়া বিড়ি, গদার মতো করে ডানহাতে ধরে থাকা নারকেল ঝাড়ু, বাঁহাত

থেকে ঝুলে থাকা কুঁজো। রাঢ় বাংলার হাড়কাঁপানো শীতের সময় ঊর্ধাঙ্গ ঢেকে রাখত একটা হাফহাতা গেঞ্জির সঙ্গে গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে। হাঁটাচলার ভাব ছিলো ধুম্‌ধরাক্কা ধরনের, মানে 'সামনে পড়ে গেলে ফলাফল তোমার দায়িত্ব' টাইপের। অনিলদা আবার একেবারে উল্টো। বয়সে বড়, ছিপছিপে চেহারায় ধীরস্থির, মাথাটা একটু নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতো, পরনে সবসময় ফুলপ্যাণ্ট, হাফহাতা শার্ট, পায়ে চটি। হাঁটাচলার ধরন দেখে মনে হত অনিলদা যেন সবসময় মনে মনে কবিতা লিখছে। হয়তো লিখতো, জানি না। আসলে নিজেদের স্বার্থের বাইরে ঐসব লোকেদের সম্বন্ধে তো আমাদের কোনো ঔৎসুক্য থাকে না! আনিলদি কথা বলতো খুব আস্তে, নীচু গলায়। বিড়ি খেতো, তবে আড়ালে। শীতকালে ফুলহাতা সোয়েটার পরতো।

ওরা দুজনে প্রতিদিন নিজের মনে একটার পর একটা রুম ঝাঁট দিত আর রুমের কুঁজোগুলোতে টাইম-কল থেকে খাবার জল ভরে আনত। ক্লাসের বা অন্যান্য তাড়া থাকলে কেউ যদি আগে, মানে আউট অফ টার্ণ নিজের রুমটা পরিষ্কার করে দিতে বলত, অজিতদার সটান উত্তর থাকত "এখন আপনারটা করলে সব হিসেব গুলিয়ে যাবে। চাবিটা দিয়ে যান, আমি পরে করে দেব।" ঘণ্টা দুয়েকের ডিউটি সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে সব কাজ কমপ্লিট। এতো সংখ্যায় এবং এতো ধরনের আবসিক থাকলেও কোনোদিন দেখিনি বা শুনতে পাইনি যে অজিতদা বা অনিলদার কাজের ব্যাপারে কেউ অসন্তুষ্ট।

এই মানুষদুটোকে আমাদের কেউ কোনদিন ফাঁকি দিতে দেখেনি, উঁচু গলায় কথা বলতে (কেদাচিৎ যখন কথা বলত) শোনেনি, অজিতদাকে বিড়ি ছাড়া এবং অনিলদাকে বিড়িসমেত দেখেনি, দুজনের কাউকে অন্য কোনও পোশাকে

দেখেনি, কারোর কাছে পয়সা চাইতে দেখেনি, কাউকে 'আপনি' ছাড়া অন্য কোনভাবে সম্বোধন করতে শোনেনি। আবার এই অজিতদাই পরীক্ষার সময় কাউকে এদিক ওদিক বেশিক্ষণ আড্ডা দিতে দেখলে অথবা কাউকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখলে সামান্য ঝালমশলা মেশানো একটা হাল্কা প্রশ্ন করে তার পাশে রেখে দিত - "আপনার পরীক্ষা তো এসে গেল?" একই টোকা অনিলদাও দিত, তবে একটু অন্যভাবে - "আপনার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল?"

এইরকম দুজন মানুষের সান্নিধ্যে একটানা পাঁচ-পাঁচটা বছর কাটিয়েছি। মাঝেমাঝে এখনও ভাবি এই ধরনের লোকেরা মনের দিক থেকে কিসের শক্তিতে এমন শক্তিশালী থাকে যে এই নিষ্ঠা এবং ধারাবাহিকতা বছরের পর বছর ধরে রাখতে পারে। কৌশলটা জানা হয়ে ওঠেনি যেহেতু জানার উপায় ছিলো না, কারণ অজিতদা তো আপসহীনভাবে নিজের কাজ করে যেত, কথাবার্তায় সময় নষ্ট করা অপছন্দের ছিল। আর অনিলদা ছিল এমনিতেই চুপচাপ মানুষ, কাজ ছাড়া কিছু বুঝতই না। এই বয়সে এসে একটু আফসোস হয় যে মানুষটদুটিকে পছন্দ করলেও তাদের জানার চেষ্টা কোনোদিন করি নি।

১১/০৮/২০১৭

*****

রবীন্দ্রনাথ এবং আমার ছাত্রবেলা

সহজপাঠের কয়েকটি ছড়া এবং অবশ্যই 'জন গন মন...', তার বাইরে রবীন্দ্রনাথকে চেনার বয়স আমার তখনো হয়নি। পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল দু-তিন বছর পরে এক কালবৈশাখীর বিকেলে। চারিদিক যখন লণ্ডভণ্ড হচ্ছে, সবাই নিজ নিজ আশ্রয়ে আশ্রয় নিয়েছে, গাছপালা করজোড়ে নতজানু হয়ে সেই ঝড়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, তখন দরজার ফাঁক দিয়ে বাবাকে দেখেছিলাম। আমাদের চারতলার ফ্ল্যাটের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝড় দেখছিল। বারান্দা থেকে শুরু হওয়া ধু ধু উন্মুক্ত প্রান্তর দুরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে হাওড়া-দিল্লী রেলপথের সামনে। উন্মুক্ত প্রান্তরের সাথে মিশে যাওয়া উথালপাতাল সেই বিকেলের কালবৈশাখীকে বাবা গান শোনাচ্ছিল '**খর বায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে, ওগো নেয়ে নাও খানি বাইয়ো...**'। দরজার ফাঁক দিয়ে জীবনে প্রথমবার গান শুনবো বলে গান শুনেছিলাম।

সাহিত্য, সঙ্গীত এসব কোনোদিনই আমার সেরকম পছন্দের ছিল না। অনেক সময় নিয়ে পড়তে হয় বলে গদ্য ভালো লাগত না। কবিতা ভালো লাগতো না মুখস্থ করতে হয় বলে। গান শোনার জন্য গান শুনতে ইচ্ছে করত না। তবে নিজের অবচেতনে একটা জিনিস আমার হত। কোনো গায়কী, গানের কোনো কলি অথবা কোনো সুর আচমকা কানে লাগলে কেন

জানিনা দাঁড়িয়ে পড়তাম, শেষ পর্যন্ত শুনতাম। ভেবে ভালো লাগে যে অভ্যসেটা ছেড়ে যায়নি, থেকে গেছে।

কলেজে ভর্তি হয়ে ভাবলাম শিল্প, সাহিত্য, কবিতা এসব থেকে বেঁচে গিয়েছি। সেই আনন্দ উপভোগ করতে করতে সেখানকার রাবীন্দ্রিক পরিবেশে কখন কিভাবে যে জড়িয়ে গেলাম বুঝতে পারিনি। নিরন্তর সেই পরিবেশের বর্ণনা দেবার এলেম আমার নেই। সেখানকার পরিবেশ উপেক্ষা করার উপায় আমার জানা নেই। তবে গুটিকয়েক প্রভাবের বর্ণনা সবার সামনে রাখার চেষ্টা করা যেতেই পারে।

ইউনিভার্সিটিতে একবার ছাত্র আন্দোলনের সময় কয়েকদিনধরে একটানা অবস্থান ধর্মঘট চলছিল। দিনশেষে পরিশ্রান্ত শরীর-মনগুলোকে উজ্জীবিত রাখার তাগিদে অন্তাক্ষরী খেলা হত সারারাত ধরে। ছেলে, মেয়ে, সিনিয়র, জুনিয়র কোনো ভেদাভেদ রাখা হত না, সবার জন্য ছিল অবারিত দ্বার। শর্ত ছিল একটাই - গান হতে হবে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত। রাতভোর ছেলেমেয়েরা পাল্টে পাল্টে যেত, কিন্তু খেলা থামত না। ছাত্র আন্দোলনের সময় অন্তাক্ষরীর সেই রাতগুলোতে প্রথম আভাস পাই রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তির।

অঙ্কের ক্লাস শেষ করে বর্ষার এক মেঘভাঙা অঝোর বৃষ্টির দুপুরে ভিজতে ভিজতে হোস্টেলে ফিরছি। জলভর্তি চোখের ঝাপসা দৃষ্টির ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা একজন লোক সঙ্গীতভবনের বাইরের দিকের একটা জানলার শিক ধরে ঝুলে ঘরের ভেতরদিকে কিছু একটা উঁকি দিয়ে দেখছে। কাছাকাছি এসে জামালদাকে চিনতে পারলাম। জামালদা ছিল এক বছরের সিনিয়র। আমরা একই হোস্টেলে থাকতাম। প্রতিবছর ঈদের ছুটি শেষে হোস্টেলে

ফিরে আসার সময় জামালদার মা আমাদের জন্য দুটো টিনে ভর্তি করে তিন-চাররকম মাংসের আর মুরগির কাবাব আর দুটো টিনে ভর্তি চালভাজা আর চিঁড়েভাজা পাঠাতেন। সেগুলো বাসস্ট্যান্ড থেকে হোস্টেল পর্যন্ত বয়ে আনার রিক্সাভাড়াটা জামালদা আমাদের কাছ থেকে আদায় করে তারপর সেই খাবারগুলোতে হাত বসাতে দিত। সেই কাকভেজা দুপুরে জানলার নিচে জামালদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ইশারায় আওয়াজ করতে বারণ করল। তারপর নিঃশব্দে নেমে এসে আমাকে উঁকি মেরে দেখতে বলল। তর্জনী তুলে দ্বিতীয়বার ইশারা করল আওয়াজ না করতে। দেখলাম ঘরের ভেতর সিলিংফ্যানের নিঃশব্দ হাওয়ার নিচে সতরঞ্চির ওপর বসে আছেন কিংবদন্তি গায়িকা। কোলের ওপর রাখা তানপুরায় সঙ্গত তুলে নিমীলিত চোখে রেওয়াজ করছেন। মনের মত না হলে মাথা ঝাঁকিয়ে গানের কোনো কোনো শব্দ বা কলি বারবার গাইছেন। ঠোঁটের কোণা থেকে গড়িয়ে আসা লালা মুছে নিচ্ছেন ধবধবে শাড়ীর আঁচল দিয়ে। ভরা বর্ষার সেই দুপুরে, বন্ধ ঘরে, মুদিত নেত্রে, বিভোর শিল্পী রেওয়াজ করে চলেছেন **‘শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে। কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব, অবলা কামিনী রে।.....**’। জীবনে দ্বিতীয়বার গান শুনবো বলে গান শুনেছিলাম।

বসন্তোৎসবের আগেরদিনের রাত আটটা-সাড়েআটটা হবে। আম্রকুঞ্জ আর গৌড়প্রাঙ্গনকে মাঝামাঝি চিরে যে রাস্তাটা আশ্রমের বাইরে চলে গেছে, সেখান দিয়ে সাইকেলে যাচ্ছি। চারদিক জ্যোৎস্নায় ঢাকা পড়ে আছে। কিছুটা সামনে আলোছায়ায় মাখামাখি হয়ে জনা দশ-পনেরো ছেলেমেয়ে হাঁটতে হাঁটতে একের পর এক খালি গলায় সমবেত কণ্ঠে

গেয়ে চলেছিল '... **মম অন্তর উদাসে, পল্লব মর্মরে কোন চঞ্চল বাতাসে....., আকাশ আমায় ভরলো আলোয় ......, আকাশ আমি ভরবো গানে....., আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে.....**'। অজান্তেই সাইকেল থেকে নেমে ওদের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করেছিলাম। অনেকক্ষণ পর আপ্লুত শরীর আর মন নিয়ে হোস্টেলে ফিরেছিলাম।

গরমকালের মধ্যরাত। অসহ্য গরমে ছটপট করছি। দিগ্বিদিক্ ভাসিয়ে হঠাৎ কানে এলো উদাত্ত গলায় '**আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে। বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে আমি যে তোর আলোর ছেলে।...**', গান শেষ হতে না হতে ভেসে এলো '**...নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন সুরে। কোন রজনীগন্ধা হতে আনব সে তান কণ্ঠে পুরে॥...**'। গলার আওয়াজ চেনা, কিন্তু উৎসস্থল বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিটি অন্ধকারের নিজস্ব এক আলো থাকে। শুধুমাত্র অন্ধকারে সেই আলো দেখা যায়। ঐ আলোর ভরসায় গায়কের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। সে হোস্টেলের ছাদে জলের ট্যাঙ্কের ওপর উঠে, সেখানে বসে গান করছে। সে যেন ছিল এক গভীর ধ্যানে ধ্যানমগ্ন।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে একটু রাতের দিকে হোস্টেলে ফিরছি। গৌড়প্রাঙ্গনের বেদির ওপর তিন-চারজন মানুষ বসে ছিলেন। চাঁদের ধূসর আলোয় কাউকে চিনতে পারিনি। আসলে, চাঁদের আলোতে শুধু অবয়ব দেখা যায়, নিশ্চিত করে কিছু চেনা মুস্কিল হয়। মুর্তিটা কল্পনা করে নিতে হয়। তাদের কথোপকথন ভেঙে ভেঙে টুকরো হয়ে কানে আসছিল। দাঁড়াতে হলো যখন তাঁদের মধ্যে থেকে একজন চারদিকে

আলোড়ন তুলে, প্রকৃতিকে থমকে দিয়ে অদ্বিতীয় কণ্ঠে শুরু করলেন, নারীরূপের মন কেমন করা সেই বর্ণনার গান - **'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।...'**। কতক্ষন গেয়েছিলেন জানি না। ধূসর মায়াময় আলোজড়ানো সেই গান, গায়ক আর সুরের সঙ্গে মিলেমিশে আমি তখন এক স্বপ্নের দেশে। ফেরার পথে চলতে শুরু করলাম আবার কোনো একদিন গান শুনবো বলে গান শোনার অপেক্ষা নিয়ে।

পরিশেষে বলি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার অপরিসীম অজ্ঞতায় নিজস্ব কি ক্ষতি হয়েছে বা কি ক্ষতি হয়নি বুঝি না। তবে এটা বুঝি শব্দ, ছন্দ, সুর থেকে অনেক দূরে, আরও অনেক গভীরে, এক অন্তহীন পরিমণ্ডলে তাঁর অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্ব মানুষের অনুভবে আর উপলব্ধিতে, মানুষের ভরসায় আর বিশ্বাসে।

২৭/০৪/২০২৫

******

শিরীষার গল্প

বছর তিনেক আগে দিন কয়েকের জন্যে ব্যাঙ্গালোর ঘুরতে গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ি। যারপরনাই খাতিরদারি। খাওয়া, ঘুম আর আড্ডা। তারপর, আবার খেতে খেতে আড্ডা। মাঝেমধ্যে একঘেয়েমিতা এসে গেলে স্বাদ পাল্টাতে একটু সেদিক বেড়িয়ে আসা। এইভাবে ছিল আমাদের সেবারের ব্যাঙ্গালোর বেড়ানো।

সন্ধ্যেবেলা বসার ঘরে সবাই জমা হত। আড্ডা জমে উঠত। যে কদিন ছিলাম প্রত্যেকটা সন্ধ্যের ছবি মোটামুটি একই ফ্রেমে বাঁধানো। টেবল্ ল্যাম্পের থেকে পাতলা হলদেটে আলোর সঙ্গে টিভির নীলাভ আলো মিশে গিয়ে এক অদ্ভুত নরম আলোতে বসার ঘর ভর্তি। সদস্যদের জনা দুয়েক হাতের তলায় কুশন্ নিয়ে আধশোয়া অবস্থায়, বাকিরা সব এদিক ওদিক সোফার ওপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে। বিভিন্ন স্বাদের কয়েকটা চিপসের মাঝারি সাইজের প্যাকেট মধ্যিখানে রাখা। আর সদ্য খালি হওয়া প্যাকেটগুলো সিলিং ফ্যানের হাল্কা হাওয়ায় জলফরিঙের মতন এদিক ওদিক গড়াগড়ি দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

সন্ধ্যের ঐ সময়টাতে শিরীষা আসত ওর ঠাকুমার সাথে। শিরীষাকে সেই আমার প্রথম দেখা। ওদেশেরই মেয়ে। অন্ধকারের মতো ঘন কালো পিঠ ঢাকা একমাথা চুল। চুলের

চেয়েও গভীর কালো গায়ের রং। ভারী গলার আওয়াজ। দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আমাদের সবার চোখে চোখ রেখে হাসত। বড় মিষ্টি, বড় গভীর, বড় আপন সেই হাসি, ঠিক যেন সমুদ্রের ফেনিল ঢেউ। সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে বেড়ানো সফেদ শুভ্র ফেনা যেমন সবার আগে নজর কেড়ে নেয়, শিরীষার হাসি হুবহু সেইরকম সবার নজর কেড়ে নেয়।

রোজ সন্ধ্যেবেলা আসত। টিভির উল্টো দিকের দেয়ালের গায়ে রাখা চেয়ারে বসে থাকতাম আমি, ঘরের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলোর সাথে আড্ডায় মশগুল। কান থাকত কলিং বেলে। শিরীষা এসেই টিভির একেবারে সামনে আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে পরত। একটানা বসে থাকত যতক্ষণ না ঠাকুমার কাজ শেষ হয়। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় হলে উঠে যেত। মাঝের ঐ ঘণ্টাখানেক সময়টুকু টিভি, নিজের ফোন, কার্পেটের সুতো আর ফ্রকের প্রিণ্টের মধ্যে ভাগ করে নিত। প্রথম যেদিন দেখা হল সেদিন তো টিভির পর্দার দিকে চোখ তুলে তাকালোই না। শুধু আমার দিকে কয়েকবার আড়চোখে তাকালো। দৃষ্টি বিনিময় হল, তবে মন বোঝা গেল না। অবশ্য চোখে চোখ পড়লেই সেই হাসি, ঐ যে বললাম সমুদ্রের ফেনার মত ধবধবে সাদা, নরম হাসি।

প্রথম দু-তিনদিন লক্ষ্য করলাম টিভির একেবারে সামনে গিয়ে বসে থাকলেও শিরীষার কিন্তু টিভি দেখায় কোনো উৎসাহই নেই। একটি বাচ্চা মেয়ের টিভির প্রতি অনাকর্ষণের ঠিক কি কারণ থাকতে পারে বুঝে উঠতে পারছিলাম না, বাড়ির অন্যেরাও সেরকম কিছু আলোকপাত করতে পারলো না। দু-তিনদিন পরে একদিন এসে ও নিজের জায়গায় বসেছে। যথারীতি টিভির দিকে চোখ নেই। কিছু না ভেবে আমি নিউজ

চ্যানেল পাল্টে কার্টুন চ্যানেল করে দিয়েছিলাম। সেদিন দেখেছিলাম শিরীষা টিভির পর্দা থেকে একবারের জন্যও চোখ সরায়নি। তারপর থেকে যে কটা দিন আমরা ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম, শিরীষা আর আমার দিকে আড়চোখে তাকাতো না, সোজাসুজি দৃষ্টি ফেলতো। সরাসরি তাকিয়ে যে হাসিটা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত, সেটার জন্য আমি কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব তা জানি না।

শিরীষার বয়েস বছর আট-নয়। আবার দশও হতে পারে। তবে তার চেয়ে বেশি বলে মনে হয়নি। বাবা ওড়িশার বেরহামপুরে, এখনকার ব্রহ্মপুরে, নিজেদের জমিজমা দেখাশোনা করে। ওখানেই থাকে। ছোট ভাই, মা, ঠাকুমার সাথে শিরীষারা এখানে থাকতো। এখানে থাকতে থাকতে শিরীষাদের মা নতুন ভালোবাসার সন্ধান পেয়ে ভাইকে নিয়ে আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর থেকে ঠাকুমা আর নাতনি এখানে একে অপরের যষ্টি হয়ে আছে। এই বয়েসে ঠাকুমা বাড়ি বাড়ি কাজ করে নাতনির বিয়ের পয়সা জমাচ্ছে।

ঠাকুমার কাজের শেষে বাড়ি যাবার সময় হলে শিরীষা প্রত্যেক আঙ্কল আর আন্টিকে আলাদা আলাদা করে 'আঙ্কল বায়, আন্টি বায়' বলে। উত্তরে যতক্ষণ প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদা আলাদা 'বায়' না শোনে, চুপটি করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখে হাল্কা হাসির একটু প্রলেপ লাগিয়ে। ওর ঐ একটাই নীরব আবদার।

মিউনিসিপ্যালিটির স্কুলে শিরীষা পড়াশোনা করে। বইখাতা ফ্রীতে পায়। স্কুলে মিড্-ডে মিলের ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহের যে দিনগুলোতে খাবারে ডিম দেওয়া হয় সেই দিনগুলোতে ও খুব খুশিতে থাকে। আমার আত্মীয়রা ওদের জন্যে রোজ খাবার

করে রাখে। কিছুতেই ওরা ওখানে বসে খায় না, বাড়ি নিয়ে যায়। সবার বাড়ির কাজ সেরে ঠাকুমা আর নাতনি বাড়ি ফিরে যায়। হাতমুখ পরিষ্কার করে একসাথে বসে কিছুক্ষণ সুখদুঃখের গল্প করে। তারপর সারাদিনের ক্লান্তি যখন শরীরদুটোতে ভারী হয়ে চেপে বসে তখন সেই খাবার খেয়ে দুজনে রাতের বিশ্রাম নেয়।

তাড়াতাড়ির মধ্যে আবার ব্যাঙ্গালোর যেতে পারলে ভালো হত। কিছু নাহোক, অন্ততঃ সেই সমুদ্র-ফেনিল নিষ্পাপ হাসিটা দেখার জন্য।

১১/০৩/২০১৮

*****

মোগল সাম্রাজ্যের পতন

ক্লাস সেভেনের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা চলছে। সেদিনের বিষয় 'ইতিহাস'। সিলেবাস ছিল হুমায়ুন থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত। মাঝখানের শের শাহকেও জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাবরকে কেন রাখা হয়নি তার কারণ এত যুগ পরে আজ আর মনে নেই, তখনও বোধহয় জানতাম না।

যাক্‌গে, মোগলদের সমস্যা মোগলরা সামলাক, আমি ফিরে যাই আমাদের পরীক্ষার সমস্যাতে। সমস্যাটা কিন্তু কোনো এলেবেলে সমস্যা ছিল না, বরং বেশ গভীর বলা যেতে পারে। বিষয় হিসেবে ইতিহাস আমার পছন্দের ছিল না। বিষয়টির ব্যাপ্তি এবং প্রসারতা এত বিস্তৃত যে ঘটনা, চরিত্র, সাল, তারিখ, কার্য, কারণ এবং আনুষঙ্গিক আরো হাজারটা বিষয় একসাথে মাখামাখি হয়ে যেত।

মোটামুটি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত আমার একটা বদঅভ্যেস ছিল - সব পরীক্ষাগুলোতে ফার্স্ট অথবা সেকেণ্ড হওয়ার। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং আনন্দদায়ক, কিন্তু বছরভোর পড়াশোনার সাথে একসঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে থাকা মানসিক চাপ দিনের পর দিন সহ্য করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। পরের দিকের বছরগুলোতে অবশ্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অভ্যেসটা ছাড়তে পেরেছিলাম। অভ্যেস বদলানোর সে গল্প অন্য জায়গায় করেছি। যাইহোক যেটা বলছিলাম, ইতিহাস বিষয়টা যেহেতু দিগন্তবিস্তৃত, কাজেই পরীক্ষার

জন্য তার প্রস্তুতিও প্রচুর সময়সাপেক্ষ। আবার এইসব ঝামেলার মধ্যে আমার মায়ের ছিল ভীষণরকম ইতিহাস-প্রীতি। ক্ষমতা বা সুযোগ থাকলে বোধহয় পৃথিবীর সব ছাত্রছাত্রীকে ,অন্য সব বিষয় বাদ দিয়ে শুধু ইতিহাস পড়তে বাধ্য করত। এই একটিমাত্র কারণে ইতিহাসের প্রতিটি পরীক্ষায় আমাকে একই প্রশ্নপত্রে দুবার পরীক্ষা দিতে হত। প্রথমটি স্কুলের ক্লাসে বসে খাতায় লিখে, দ্বিতীয়টি বাড়ি ফিরে দই-চিঁড়ে খেতেখেতে মায়ের সামনে, মৌখিকভাবে। তাই ঘরে বাইরে সর্বত্র সবসময় মানসিক দিক দিয়ে চাপে থাকতাম। তবুও সবরকম চাপ সহ্য করে সেদিনের পরীক্ষার জন্যে তৈরি হয়ে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট ক্ষণে পরীক্ষার হলে গিয়ে বসলাম। আমাদের ক্লাসটা ছিল একতলায়। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথম বেঞ্চে আমার সিট। দরজার বাইরে টানা বারান্দা, যেরকম সব স্কুলে হয় আরকি। বারান্দার পরে বড় সাইজের খেলার মাঠ। প্রতি বেঞ্চে দুজনের বসার ব্যবস্থা। আমার বেঞ্চিতে একদিকে আমি আর একদিকে দেখলাম ধূর্জটির সিট। ধূর্জটির সঙ্গে বসতে হবে দেখে মনটা একটু খুঁতখুঁত করে উঠল। কিন্তু উপায় ছিল না, বসতেই হলো। সেই যুগের সংজ্ঞা অনুসারে ধূর্জটি ছিল খারাপ ছেলে। বেশিরভাগ পরীক্ষায় ও ফেল করত। পুরো ছাত্রজীবনে ঐ একজনকেই দেখেছি যে কখনোসখনো পাশ করলে নিজেই অবাক হয়ে যেত। পড়াশোনায় এইরকম কারুকার্য ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপারে ধূর্জটির খ্যাতি অথবা অখ্যাতি বিস্তৃত ছিল। টিফিনের পর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ধূর্জটির শরীর থেকে পোড়া তামাকের গন্ধ পাওয়া যেত। কথায় কথায় শালা বলত। কারোর সঙ্গে ঝগড়া হলে তার বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে থুতু ফেলে আসত। নিজের স্কুলব্যাগে সিনেমার পোস্টার রাখত। পকেটে করে কাচের গুলি নিয়ে আনত। অন্যদের ব্যাগের ভেতরে গঁদের আঠা রেখে দিত, চুইংগাম

খেত। এইসব নিত্যনতুন বিভিন্ন কারণে ধূর্জটি স্কুলজীবনের বেশিরভাগটাই ক্লাসের বাইরের বারান্দায় নীলডাউন হয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল।

যাইহোক, ধূর্জটিকে নিয়ে আমার অস্বস্তির মধ্যে কোশ্চেন পেপার এলো। তখনকার দিনে একশ নম্বরের পরীক্ষা হতো আড়াই ঘণ্টার। শেষ প্রশ্নটা সাধারণত থাকত কুড়ি নম্বরের, বাকিগুলো পাঁচ থেকে দশের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। সেদিন কুড়ি নম্বরের প্রশ্নটা ছিল 'যে কোন একজনের শাসনকাল এবং শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখ - আকবর অথবা আওরঙ্গজেব'। রাজা বাদশাহদের 'শাসনব্যবস্থার' ওপর প্রশ্নের উত্তরগুলোতে অনেক লিখতে হয়। প্রশ্নপত্রের দুজনেই আবার উনপঞ্চাশ বছর ধরে রাজত্ব করে গেছে। কিন্তু লিখতে তো হবেই। আমি লিখেছিলাম আকবরকে নিয়ে। আওরঙ্গজেবকে বাদ দেওয়ার অবশ্য একটা কারণ ছিল। দুজনের মধ্যে আকবরকে আমার কাছের লোক বলে মনে হতো। অপরজন চিরকালই আমার কাছে বেশ খটমট ব্যাপার ছিল, তাই এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করতাম। সব প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ করে রিভাইজ্ করছি। মনটা বেশ তৃপ্তিতে ভরপুর। একটু খুশিখুশি ভাবও আছে কারণ ডিসেম্বরের ফাইনাল পরীক্ষার আগে আর ইতিহাস পরীক্ষা দিতে হবে না। ঊমা দিদিমনি হলের বাইরে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ায় মগ্ন। আড়চোখে দেখতে পেলাম ধূর্জটি তখনো লিখে যাচ্ছে। একটু অবাক লাগল। আরও অবাক হলাম যখন ও মুখ না তুলে লিখতে ফিসফিস্ করে জিজ্ঞেস করল "তুই তো আবার ভালো ছেলে, ফার্স্টবয়! নিশ্চয় আওরঙ্গজেব লিখলি"? বললাম "না, আকবর লিখেছি"। তারপর লেখা শেষ করে, জোড়ে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল "আমিও ঐ ব্যাটাকেই লিখলাম বুঝলি! আমার উত্তরটা

ঠিকঠাক আছে কিনা একটু দেখে দে"। এই বলে খাতাটা আমার দিকে তেড়ছা করে বাড়িয়ে দিল। ভীষণরকম একটা উচিত-অনুচিত টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে আমি প্রমাদ গুনলাম। আমার দোনামনা বুঝতে পেরে ধূর্জটি ফিসফিস করল "ঊমাদি এখন কাগজ পড়ছে, এদিকে তাকাবে না"। আড়চোখে যতটা পারলাম পড়লাম। কিছুটা পড়ার পরে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা, কানদুটো গরম হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে পনের মিনিট আগের ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেছে। ভ্যাবাচ্যাকা গলায় বললাম "তুই তো আকবর লিখিসনি, আওরঙ্গজেব লিখেছিস! আবার মাঝেমাঝে শাহজাহানের নামও ঢুকিয়েছিস! এই কোশ্চেনে তুই তো কোনো নম্বর পাবি না। এখন কি করবি? ওয়ার্নিং বেলও পড়ে গেছে"। নির্বিকারভাবে "ধুহ্ শালা" বলে খুব ব্যস্ততার সাথে খাতার পাতা উল্টেপাল্টে আবার কিসব লিখতে লাগল। ঐরকম পরিস্থিতিতে ওর দিকে তাকানোর সাহস আমি তখন হারিয়ে ফেলেছি। সত্যিকথা বলতে খারাপও লাগছিল ওর জন্য।

ইতিমধ্যে ফাইনাল বেল পড়তেই পরীক্ষা শেষ। ঊমাদির টেবিলে গিয়ে আমরা সবাই খাতা জমা করলাম। যতোই খারাপ ছেলে হোক, হল থেকে বেরোনোর সময় কিছুটা কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম "নতুন করে আবার লিখলি"? ধূর্জটি ফিসফিস্ করে উত্তর দিয়েছিল "ধুর, আবার কে লেখে! আওরঙ্গজেব আর শাহজাহানদের নাম কেটে সবজায়গায় আকবরের নাম লিখে দিয়েছি"।

১২/০১/২০২১

*****

ভোলার বাবা

আমি মনে করি এই লেখাটির অবশ্যই একটি ভূমিকা দেওয়া প্রয়োজন।

অনেকরকম অভ্যেসের সঙ্গে আমার কিছু বদভ্যেসও আছে। তার মধ্যে একটি হলো বাড়ির বাইরে থাকার সময় নিজের শ্রবণশক্তিকে একটু বেশিরকম তীক্ষ্ণ করে রাখার চেষ্টা করি। এরমধ্যে আড়ি পেতে শোনার ইচ্ছে বা অভ্যেসের স্থান নেই। একেবারে নির্ভেজাল আকার এবং আকৃতিতে ভালোমন্দ সবরকমই কানে আসে। এই বদভ্যেসটি পালন করতে গিয়ে কদাচিৎ এমন কিছুকিছু সংলাপ কানে আসে যেগুলো আমার ব্যক্তিগত ধারণায় মানুষের চিন্তাশক্তিতে, তার ভাবনাতে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। বছর দশেক আগে এক ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে বসে এইভাবেই কানে এসেছিল দুই অপরিচিত মধ্যবয়সী সহযাত্রীর মধ্যেকার বার্তালাপ। অনেকক্ষণের সেই সংলাপটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কানে আসেনি, ভেঙে ভেঙে এসেছিল।

নীচের লেখায় আমি চেষ্টা করেছি সেই বার্তালাপটিকে আমার মত করে ধরে রাখতে। কাজেই সেই অর্থে এই লেখার কাহিনী বা ঘটনা কোনোটাই আমার মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। লেখাটি শুধুমাত্র কানে আসা একটি বার্তালাপকে জামাকাপড় পরিয়ে, সাজিয়ে গুজিয়ে, কাগজের ওপর কলমের দাগ দিয়ে ধরে

রাখার চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেহেতু কোনো গল্পের বা লেখার পরিচিতি তার একটা নামের মধ্যে দিয়ে হয়, তাই আমি এই গল্পের নাম দিয়েছি - **ভোলার বাবা।**

আমাদের দেশের প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলের এক নাম-না-জানা গ্রাম। সেই গ্রামের একমাত্র স্কুলটি গ্রামের একেবারে সীমানার ধারে। বলতে গেলে স্কুলের একদিকের বেড়ার পাঁচিলটাই হচ্ছে গ্রামের সীমানা। তার পরে যতদূর চোখ যায় ক্ষয়াটে সবুজ ধূধূ মাঠ। মাঝেমধ্যে ছিটেফোঁটা জলের মতো কয়েকটা বড়বড় গাছ। একমাত্র ব্যতিক্রম বলতে ঐ পাঁচিলটার ওপারের সেই প্রান্তরের কাছে, দূরে এবং আরও দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েকটা ছোটছোট বস্তি। চার-পাঁচ ঘরের সেই বস্তিগুলোতে বাস করে সমাজের সবচেয়ে গরিব কিছু পরিবার।

এইরকম প্রান্তিক একটি অঞ্চলের স্কুলের কাছ থেকে খুব উঁচুমানের পড়াশোনা আশা করাটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। তবে পড়াশোনার খামতিটুকু দু-তিনজন শিক্ষক মিলে নানাভাবে পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। লক্ষ্য রাখেন যাতে ছেলেমেয়েদের মানসিক কাঠামোগুলোর সযত্নে পরিচর্যা এবং লালনপালন হয়।

প্রতি বছরের মত সেবছরও সেপ্টেম্বর মাস এসেছিল। এই মাসটা ঘুড়ি ওড়ানোর মাস বলে প্রকৃতি ঘুড়ি ওড়ানোর আদর্শ আবহওয়া তৈরী করে দেয়। আসন্ন পূজোর আনন্দ বয়ে আনতে ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি দিয়ে আকাশ ঢেকে দিয়েছিল। সেবছর শিক্ষকরা স্কুলে ঘুড়ি ওড়ানোর ইণ্টারক্লাস প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। রোজ টিফিনের সময় প্র্যাকটিস চলত জোরকদম। ভোকাট্টা হয়ে উড়ে যাওয়া কিছু

ঘুড়ি কাছের এবং দূরের বস্তিগুলোর বাচ্চারা কুড়িয়ে নিয়ে মহা আনন্দে উড়িয়ে বেড়াত।

সবচেয়ে কাছের বস্তিটায় থাকে আমাদের ভোলা। বছর আষ্টেকের হবে, আবার নয়ও হতে পারে। তবে তার বেশি নয়। বাবা অনেক দূরে প্রায় দিন দুয়েকের দূরত্বে কোথায় যেন ইঁটভাটায় কাজ করে। হাতে কিছু পয়সা জমাতে পারলে ছ-মাসে ন-মাসে একবার করে ছেলে-বৌয়ের কাছে আসে, না জমাতে পারলে আসে না। মা গ্রামের দুএকটা বাড়িতে একটুআধটু কাজটাজ করে। পরিস্থিতির বদান্যতায় আমাদের ভোলা সারাদিন মুক্তবিহঙ্গ। নিজের মনে ঘুরে বেড়ায়, খেলে বেড়ায় আর ঘুড়ির সময় কাটা ঘুড়ি পেলে বন্ধুদের সঙ্গে উড়িয়ে বেড়ায়।

কম্পিটিশনের দিন ইস্কুলের মাঠ হয়ে উঠেছিল মনুষ্যসম্প্রদায়ের সবরকম অনুভূতির এক জগাখিচুড়ি প্রকাশস্থল। চেঁচামেচি, উচ্ছ্বাস, দুঃখ, রাগ, অভিমান, আনন্দ, হাসি, কান্না এবং আরও জানা-অজানা কতসবকিছু অনুভূতির এক আজব মিলনস্থল। পাঁচিলের ওদিকে একটু দূরে ভোলা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল ওর বন্ধুদের সঙ্গে। তবে সেখানে কোনও প্রতিযোগিতা ছিল বলে মনে হচ্ছিল না, ছিল একসাথে মিলেমিশে ঘুড়ি ওড়ানোর মতো সুন্দর এক অনাবিল আনন্দের উপভোগ। অল্পক্ষণধরে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ওদের আনন্দের উদ্‌যাপনের ধরনটি কিন্তু ছিল একটু অদ্‌ভুতরকমের।

বস্তির বাচ্চাদের আনন্দের সেই অদ্‌ভুত বহিঃপ্রকাশ স্কুলের একজন শিক্ষকের নজর এড়ায়নি। পুরোটা অনুধাবন করতে না পারলেও উনি নজর করলেন ভোলাদের আনন্দ উল্লাসে

পরিণত হয় যখনই ওদের নিজেদের কারোর ঘুড়ি ভোকাট্টা হয়ে যায়।

অনেক ভেবেও এই অতি উল্লাসের কারণ সম্বন্ধে তিনি কুলকিনারা করতে পারলেন না। অবশেষে কৌতূহল দমন করতে না পেরে তিনি স্কুলের গেট দিয়ে বেরিয়ে ভোলাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। অর্দ্ধউলঙ্গ রুক্ষ রোগা বাচ্চাগুলো গুটিগুটি ভয়মাখানো পায়ে ওনার চারপাশে এসে দাঁড়াল। শিক্ষকমশায় ওদের কাছে জানতে চাইলেন ঘুড়ির ভোকাট্টাতে ওদের এত খুশি হওয়ার কারণ। এরকম একটা অদ্‌ভুত প্রশ্ন শুনে ছেলেগুলো একটু হতচকিত। নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে সামান্য লাজুক লাজুক মুচকি হাসি দিল, কিন্তু বলল না কিছুই। আমাদের শিক্ষককে আরেকটু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। অবশেষে ভোলা ওনাকে ওদের ঘরে নিয়ে গেল, পেছন পেছন ফিসফাস করতে করতে পুরো দঙ্গল।

ঘরের মেঝেতে ইতস্তত ছড়ানো গোটা কয়েক ঘুড়ি। বোঝাই যায় কোনোটাই নতুন নয়, সবগুলোই কুড়িয়ে পাওয়া ভোকাট্টা ঘুড়ি। ভোলাদের চেয়ে আরও ছোট একটা ছেলে একনিষ্ঠ মনে, নিজের কাঁচা হাতের লেখায় প্রতিটা ঘুড়িতে কয়লা দিয়ে একজন একজন বন্ধুর নাম, আর গ্রামের নাম লিখছিল। এদিকে শিক্ষকমশায়ের কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। প্রথমে ভোকাট্টাতে উল্লাস, তারপরে আবার কুড়িয়ে আনা ঘুড়িগুলোতে নামধাম লেখা। ইতিমধ্যে ওনার অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে ছেলেগুলোর মুখের মুচকি হাসি ততক্ষণে আরও জাঁকিয়ে বসেছে।

অবশেষে সেই বিকেলের সব রহস্যের উন্মোচন আমাদের ভোলাই করল। ভোলার কথাতেই বলি। "আমাদের ঘুড়িগুলো

ভোকাট্টা হলে কোথায় কোন দিকে ভেসে গিয়ে পড়ে, কে কোথায় কুড়িয়ে পায় আমরা জানতে পারি না। কিন্তু যারা কুড়িয়ে পায় তারা ঘুড়িতে লেখা আমাদের নাম আর গাঁয়ের নাম জানতে পারে। তাদের কেউ কেউ আমাদের কাছে আসে; আমরা বন্ধু পাতাই। এই বলাই, কেষ্ট, হরি, মধু আমরা সবাই এমনি করে বন্ধু পাতিয়েছি।"

পরেরদিন স্কুল ছুটি ছিল। ভরদুপুরে, চারদিক ভাতঘুমে নিঃঝুম হয়ে যাবার পর আমাদের শিক্ষক ভোলার কাছে এসেছিলেন। উনি জানতে এসেছিলেন ভোকাট্টার এই খেলাটা ওরা কোথায় শিখেছে। ভোলার কথায় ওর বাবা আগেরবার যখন ঘর এসেছিল তখন ভোলা ঘুড়ি কেনার পয়সা চেয়েছিল। পয়সা না থাকায় বাবা দিতে পারেনি। ঘুড়ি কিনতে না পেরে ভোলা ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল। কিছুতেই চুপ না করায় মা বাখারি দিয়ে খুব মেরেছিল, সঙ্গে বেশকিছু চড়থাপ্পড়ও। আর পয়সা না দিতে পেরে, ইঁটভাটায় ফিরে যাবার আগের দিন বাবা এই খেলাটা ভোলাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বাবা শিখিয়ে দিয়েছিল এই খেলায় একটা ঘুড়ি ভোকাট্টা হলে কাটা ঘুড়ি ফেরৎ পাওয়া যায়, সাথে একজন নতুন বন্ধুও পাওয়া যায়। তাছাড়া এই খেলায় ঘুড়ি কিনতেও হয় না, আবার ভোকাট্টা হয়ে গেলে ঘুড়ি শেষও হয় না।

০৫/০৩/২০২২

******

চম্বলের অতীত-কথা

অনেকবছর আগে খুব উৎসাহ নিয়ে গোয়ালিয়র বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই উৎসাহের কয়েকটি উৎস ছিল। আমরা আগে কোনদিন মধ্যপ্রদেশ দেখিনি। সেইসময়ে দেশের সবচেয়ে দ্রুতগামী এবং সবচেয়ে লম্বা সফরের দিল্লি - ভোপাল শতাব্দী এক্সপ্রেসে যাত্রার সুযোগ। সবচেয়ে বেশি উৎসুকতা ছিল চম্বলকে নিয়ে। বাল্যবয়সের সীমানাহীন এক কল্পনার চম্বল।

মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ আর রাজস্থানের কিছুটা করে অংশ জড়িয়ে ষোল হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে নিজেকে বিস্তৃত করে রেখেছে চম্বল উপত্যকা। ইন্দোর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার মত দূরে জনাপাও গ্রাম। কার্তিক পূর্ণিমাতে এখানকার মেলা খুব প্রসিদ্ধ। গ্রামের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিন্ধ্যাচল পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু, পৌনে তিনহাজার ফিট উচ্চতার জনাপাও পাহাড়। কথিত আছে এই জায়গাটিতে ভগবান পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। চম্বল নদীর উৎস এই জনাপাও পাহাড় থেকে। সেখান থেকে রওনা হয়ে এক হাজার কিলোমিটার মতো আঁকাবাঁকা পথে ঘোরাঘুরি করে, চম্বল উপত্যকার ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ার কাছে যমুনাতে মিশে যায়। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ক্ষয়িষ্ণু অনুর্বর মাটি বারোমেসে চম্বলের স্রোতে অনন্তকাল ধরে ক্ষয়ে যেতে যেতে এযুগের চম্বল গিরিখাত বা চম্বল উপত্যকা,

ইংরেজিতে পরিচিতি চম্বল ভ্যালি। ছোটবেলায় বাড়িতে আসত শুকতারা সাপ্তাহিক পত্রিকা। চম্বলের সঙ্গে আমার পরিচয় পত্রিকার পাতাগুলোতে। শুকতারা আমাদের কল্পনায় এঁকে দিয়েছিল সেখানকার ভৌগোলিক ভয়াবহতার ছবি। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সেখানকার বসবাসকারী তখনকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ কয়েকজন দুর্ধর্ষ ডাকাতের সঙ্গে। রক্ত জল করা সমস্ত নাম - ডাকু মান সিং, ডাকু নির্ভয় সিং, পুতলিবাই, পান সিং তোমর! আরেকটু বড় হয়ে সেইসময়ের 'অভিশপ্ত চম্বল' সিনেমা দেখার পরে চম্বল তার রুদ্র মূর্তি এবং চরিত্র সমেত চিরকালের জন্য মনে গেঁথে গেছে। বহু দশক পরে তাকে রক্তমাংসে দেখার সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চকরভাবে ভালো লাগছিল। আগ্রা থেকে ছেড়ে আসার পর আমাদের ট্রেন তার যাত্রার বেশ কিছুটা সময়ধরে ছোটবেলার সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া চম্বলের ভয়াবহ গিরিখাতগুলোর ভেতর দিয়ে চম্বল নদীর ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখেছিলাম সকালের পরিষ্কার আলোয় শুষ্ক, রুক্ষ, বাদামি রঙের চম্বল - একদিকে ভীষণভাবে কর্তৃত্বব্যঞ্জক কিন্তু চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে শ্বাসরুদ্ধকারী রোমহর্ষক কিন্তু ধ্যানস্থির।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে গোয়ালিয়রে নেমেছিলাম। বৃষ্টি হচ্ছিল, থেমেছিল পরেরদিন সকালে। ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতা সমাধানের পরামর্শ দিয়েছিল হোটেলের রিসেপশনের ছেলেটি। তিনটি জায়গার নাম দিয়ে বলেছিল এসব জায়গায় কেউ সচরাচর যায় না, তোমাদের ভালো লাগতে পারে। বৃষ্টি ধরতেই আমরা রওনা দিয়েছিলাম গোয়ালিয়র থেকে পঁয়তিরিশ কিলোমিটার দুরে মোরেনা জেলার বাতেশ্বর, পদাওলি আর মিতাওলির উদ্দেশ্যে। গোয়ালিয়র শহরের

ভেতর থেকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে গন্তব্যের দিকে। তিনটে জায়গা একে অপরের থেকে দু-তিন কিলোমিটারের মধ্যে। চম্বল উপত্যকার বড় একটি অংশ পড়ে মধ্যপ্রদেশের এই মোরেনা জেলায়।

বাতেশ্বর

যাত্রাপথের শেষ দিকের প্রায় দশ কিলোমিটার ভালোরকম অস্বস্তি বা ভয়ের উদ্রেক করে, বিশেষ করে পরিবার সঙ্গে থাকলে। আমার সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী আর মেয়ে। সিঙ্গল রোড, দিগন্তবিস্তৃত কোমর ছাড়িয়ে বেড়ে ওঠা জোয়ারের ক্ষেত। ক্ষেতের মধ্যে অনেকটা করে দূরে দূরে হঠাৎ হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা একটা করে চুনকাম করা দুধ-সাদা একতলা বাড়ি। ছড়ানো ছেটানো ঐ একানে বাড়িগুলো স্বস্তির চেয়ে বেশি শঙ্কার সৃষ্টি করে, বিশেষকরে কেউ যখন চম্বলে ঘুরে বেড়ায়। এতো শঙ্কা আশঙ্কার মধ্যে দেখতে পেলাম এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো ছয় - সাড়েছয় ফিট করে লম্বা রুক্ষ তীব্র চেহারার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাহী মাথায়-পাগড়ি, হাতে-লাঠি জনাকয়েক মানুষ আর তাদের সাথে বেশকিছু মোষ। ব্যস, ঐপর্যন্ত। অস্বস্তি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ড্রাইভারসাহেব জানালেন বছর দশেক আগেও এদিকটায় চম্বল ডাকুদের ভয়ে কেউ আসত না। 'রোড্-শোড্ তো কুছদিন পহ্লেই বনা'। এসব শোনার এবং চারদিক দেখার পরে আর এগোনো উচিত হবে কি হবে না ভাবছিলাম। ভাবনাচিন্তা করতে করতে অবশেষে আমরা বাতেশ্বর পৌঁছে গিয়েছিলাম।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝতে পারলাম আমরা এসে দাঁড়িয়েছি এক সম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষের মুখোমুখি। কিসের ধ্বংসাবশেষ তার ধারণা ছিল না। কিছু মানুষকে দেখলাম সেই ধ্বংসস্তূপের

ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে মনযোগ সহকারে কিছু একটা করছে। মাঝেমাঝে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। সবার চোখে সেই তীব্রতা মাখানো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কি করব না করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ভাবনা দুর্ভাবনার টানাপোড়েনের মধ্যে একজন লোককে দেখতে পেলাম সেই ভগ্নাবশেষের অপর দিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বছর তিরিশেক বয়স, হাতে একটা ফাইল, বুকপকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে পরিচয়পত্র। পকেট থেকে পরিচয়পত্র বার করে নিজের পরিচয় দিলেন আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার (এ.এস.আই) সাইট সুপারভাইজার হিসেবে। আমরা বাতেশ্বর সম্বন্ধে জানতে এসেছি শুনে বেশ অবাক হয়ে বলেছিলেন যে ওখানে কেউ আসে না। না আসার কারণ জানতে চাইলে বলেছিলেন প্রথমত, পুরাতত্ত্বে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা খুব সীমিত, দ্বিতীয়ত চম্বলের এই জায়গাটার আইনি শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে লোকেরা এখনও অনেক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। আমরা যদি চাই তাহলে উনি নিজে পুরো জায়গাটা আমাদের ঘুরিয়ে দেখাবেন, বাতেশ্বরের অতীতের কথা বলবেন, বর্তমান কাজকর্মের কথা বলবেন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমাদের সাথে ভাগ করে নেবেন। এরকম সুযোগ সচরাচর পাওয়া যায়না, তাই সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করিনি। পরবর্তী ঘণ্টাদেড়েক স্বপ্নের মতো কেটেছিল।

অষ্টম শতাব্দী থেকে পরবর্তী তিনশ বছর ধরে বাতেশ্বরে একগুচ্ছ শিবমন্দিরের স্থাপনা করে গুর্জারা-প্রতিহারা রাজবংশ। এদের রাজত্বের বিস্তৃতি ছিল বর্তমান গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের উত্তরিভাগ নিয়ে। এরা শুধু গুর্জারা অথবা শুধু প্রতিহারা নামেও পরিচিত। ইতিহাস বলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়ে যায়

কোনো ভয়ংকর ভুমিকম্পে অথবা আক্রমণকারী মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে। সত্যি কি মিথ্যে জানার উপায় নেই। শোনা যায় এই অঞ্চলের এখনকার হত্যাকর্তা হচ্ছে ডাকু নির্ভয় সিং এবং তার দলবল। এও শোনা যায় যে তাদের অনুমতি নিয়েই এ.এস.আই এখনকার কাজ শুরু করতে পেরেছে। এ.এস.আইয়ের বর্তমান কাজ ছোট একটুকরো জায়গার মধ্যে সীমিত, যেখানে দুশোটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সেগুলির পুনরুদ্ধারের কাজ পুর্ণোদ্যমে চলছে। তাদের রিসার্চ অনুসারে পাশের লাগোয়া ঘন জঙ্গলে আরও হাজারখানেক এরকম মন্দির এখনও মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। আমরা যে সময় গিয়েছিলাম তখন কিছু মন্দিরের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, কিছুর কাজ প্রায় শেষের পথে, কয়েকটিতে কাজ আরম্ভ করার জন্য জিনিসপত্র একজায়গায় জড়ো করা হয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ভাঙা ছাদের টুকরো, ভাঙা স্তম্ভের টুকরো আরও নানাবিধ ভেঙে পড়া ইতিহাসের খণ্ড-বিখণ্ড। প্রতিটি টুকরোর গায়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা। ওখানে সম্পূর্ণ অবস্থায় উদ্ধার করা গেছে একটি শিবমন্দির। সেই পুনরুজীবিত মন্দিরে এখন আশপাশের গ্রামবাসীরা দৈনিক পুজো করে। মন্দিরের ঠিক সামনে উদ্ধার করা গেছে একটি আস্ত জলাধার। পাওয়া গেছে হলঘরের ভগ্নাবশেষ। মনে করা হচ্ছে হলঘরটি ছিল সেইসময়ের কোনো স্কুলের। ঘুরে দেখতে দেখতে আলাদা করে দু-তিনটি জিনিস আমাদের চোখে পড়েছিল। সব মন্দিরের উচ্চতা ছিল সমান - বারো ফুট। পুনরুদ্ধারিত মন্দিরগুলি দেখে আমরা অন্তত বুঝতে পারিনি যে অদূর অতীতে এগুলি সব ধ্বংসস্তূপের নীচে ছিল। এখানকার বেশিরভাগ শিবলিঙ্গ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। অতীতের

আর্তি জড়ানো ধ্বংসের মধ্যেও ছিল জীবনের বেঁচে থাকার ছন্দ। আমাদের ভালো লেগেছিল অসংখ্য ময়ুরের নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো দেখে, তাদের কেকাধ্বনি শুনে। উপভোগ করেছিলাম মাঝেসাঝে তাদের পেখম তুলে নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনের। ইতিহাস আর বর্তমানের, সৃষ্টি আর ধ্বংসের মিলনস্থলে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ানো কয়েকটি পুনর্নির্মিত মন্দিরের চূড়ায় বৃষ্টির আলিঙ্গনে ময়ুরদের পেখম তুলে পরম নিশ্চিন্তে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য অবলোকনের অভিজ্ঞতা ছিল নৈসর্গিক, চিরন্তন। সেদিনের সেই বৃষ্টির বিকেলে আমরা তিনজন ছিলাম আশীর্বাদধন্য। সময় শেষে সেই নিষ্ঠাবান তরুণ যুবককে তার একনিষ্ঠতার জন্য অশেষ শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বাতেশ্বর থেকে রওনা দিয়েছিলাম।

রাস্তায় উঠে নজরে পড়েছিল একটু দূরে পাথরের তৈরি একক কাঠামোর। একলা দাঁড়িয়ে ছিল একটি মন্দির। মাথার ওপর বৃষ্টি-ভারী কালো মেঘ সত্ত্বেও আমাদের ড্রাইভার নিজে থেকে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন। ভুতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় এবং উঁচু মন্দির। দেয়ালে খোদাই করা গরুড়ের মূর্তি দেখে খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। যতদূর জানি ভগবান বিষ্ণুর বাহন, শক্তি আর অহংকারের প্রতীক, গরুড়ের মূর্তি সাধারণত খোদিত থাকে বিষ্ণুমন্দিরের গায়ে।

এ.এস.আইয়ের ছেলেটির কাছে ফিরে গিয়ে সঠিক তথ্য জেনে নেওয়ার উপায় ছিল না, কারণ সেই মুহূর্তে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তুমুল বৃষ্টি। রওনা দিয়েছিলাম মাত্র এক কিলোমিটার দূরে পদাওলির পথে, বৃষ্টি থামার আশা নিয়ে। আমাদের

সবাইকে অবাক করে সেখানে পৌঁছনোর আগেই বৃষ্টি থেমে রোদ উঠে গিয়েছিল।

পদাওলি

নাম গড়হী পদাওলি। এই অঞ্চলের 'গড়হী' আর অন্যান্য জায়গার 'গড়' বা 'দুর্গ' একই জিনিসের ভিন্ন নাম। ইতিহাস বলে দশ-এগারো শতক থেকে এখানে একটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা কবে হয়েছিল জানতে পারিনি। আমাদের ধারণা বাতেশ্বরের মন্দিরগুলোর সমসাময়িক হতে পারে।

পারম্পরিক ইতিহাস থেকে জানা যায় আঠেরো শতকে রাজস্থানের ঢোলপুরের শাসকেরা এই অঞ্চলটি অধিগ্রহণ করেছিলেন। সৈন্যসামন্ত, কর্মচারীদের বসবাসের জন্য মন্দিরের চারপাশ ঘিরে এই গড়হী বা দুর্গ তখন তৈরি করা হয়। সেই সময় থেকে জায়গাটির নাম হয় গড়হী পদাওলি।

মন্দিরটি বর্তমানে যেহেতু বন্ধ করে দেওয়া গড়হীর ভেতরে পড়ে গেছে, তাই সেটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। শুধুমাত্র প্রবেশতোরণটি গড়হীর বাইরে, এখনকার রাস্তার ওপরে। পঁচিশটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে মন্দিরের প্রবেশতোরণ। ওঠার মুখে দুপাশে দুই দ্বারপাল সিংহ। তোরণের মূল কাঠামোটি তুলনামূলকভাবে অক্ষত অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঢোলপুরের খ্যাতি সেখানকার পিঙ্ক মার্বেলের জন্য। তোরণটিও তৈরি করা হয় পিঙ্ক মার্বেল দিয়ে। চূড়ার ভেতরদিকে আর স্তম্ভগুলোর গায়ে অদ্ভুত সুন্দর সব খোদাইয়ের কাজ - কৃষ্ণের জীবনীর কিছু কিছু অংশ, রামায়ণ মহাভারতের টুকরো টুকরো অংশ, কিছু আছে পাখি,

গাছপালা। নীচে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল অজস্র সব মুর্তির, পশুপাখির, কারুকার্যকরা স্তম্ভের এবং আরও নানারকম ভাস্করের বিভিন্ন আকার এবং আকৃতির টুকরো। স্থানীয় লোকেদের সাথে কথা বলে জেনেছিলাম এই শতকের প্রথম দশকে মন্দিরটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এ.এস.আই. করেছিল। কিন্তু এতো শোচনীয় অবস্থায় মন্দির এবং মন্দিরচত্বরটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল যে সেই কাজ সম্ভব হয়নি। কারুকার্যখচিত, ভেঙে পড়া ছোট বড় অনেক টুকরো এখন এ.এস.আই. গোয়ালিয়র মিউজিয়ামে রাখা আছে।

প্রবশতোরণটি দেখা শেষ করে তিন কিলোমিটার মতো দূরে মিতাওলির উদ্দেশ্যে রওনা দেবার জন্য বেরিয়ে এলাম। আকাশে মেঘের মনোভাব দেখে ড্রাইভারসাহেব একটু দোনামোনা করছিলেন। জনমানবহীন ঐ আস্বস্তিকর অচেনা নির্জন জায়গায় আমাদের দিক থেকে জোর করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে বললেন "চলিয়ে! আপলোগ্‌কো ফির কব্‌ আনা হোগা, নহি হোগা! আজই চলতে হ্যায়" - আবার কখনও তোমাদের আসা হবে কি হবেনা কে জানে! আজই যাওয়া যাক। অচেনা মানুষটির কাছ থেকে পাওয়া পরম সেই স্বস্তি আর আশ্বাসনের ভরসায় আমরা রওনা দিয়েছিলাম মিতাওলির উদ্দেশ্যে।

মিতাওলি

অদ্‌ভুত এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম শেষবিকেলে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সংজ্ঞা এখানে নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়। সেই সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না, আত্মভুত করা যায়। দিকচক্রবাল ছুঁয়ে থাকা উন্মুক্ত সবুজ প্রান্তর, আকাশভর্তি

নিশ্ছিদ্র নিশিকালো মেঘ, প্রান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে ছোট্ট একটা টিলা। টিলার ঠিক নীচে সীমানাহীন সেই প্রান্তরের একমাত্র বেলের গাছটি দাঁড়িয়ে দ্বারপালের ভুমিকায়। টিলার ওপর পৌঁছে যেতেই বৃষ্টি নেমেছিল। সে এক অঝোর, অবিশ্রান্ত, মনমাতানো বৃষ্টি।

বেলগাছের পাশ থেকে পাথরের বড় বড় ব্লক বা চাঙড় ফেলে তৈরি ঊনচল্লিশটি সিঁড়ি বেয়ে শ-খানেক ফিট উঁচুতে টিলার ওপর 'চৌষট্ যোগিনী মন্দির'। গোলাকৃতি গর্ভগৃহে শিবের পুজো হয়। গর্ভগৃহকে বৃত্তাকারে ঘিরে আছে ছাদবিহীন একটি প্রাঙ্গণ। আবার প্রাঙ্গণের পরিসীমা বরাবর ভেতরদিকে বৃত্তাকারে আছে ছোটছোট লাগোয়া মন্দির, সংখ্যায় পঁয়ষট্টি। বৃষ্টির কারণে কিছুই ঘুরে দেখতে পারিনি, সেখানে শুধুমাত্র পৌঁছতে পেরেছিলাম। ঐ মন্দিরগুলির একটিতে আছে দেবীর প্রতিকৃতি। বাকিগুলিতে আগে যোগিনীদের প্রতিকৃতি ছিল। বর্তমানে আছে শিবের প্রতিকৃতি। কবে এবং কেন প্রতিকৃতিগুলির অদলবদল হয়েছিল অথবা আদৌ সেগুলি অদলবদল করা হয়েছিল কিনা সেসম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। সঠিক তথ্যের অনুপস্থিতিতে অথবা নিদেনপক্ষে পারম্পরিক ইতিহাসের অনুপস্থিতিতে কল্পনা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তাই প্রশ্নের একটা অবকাশ আমার মনে থেকেই গেছে। মন্দিরগুলির ওপরে টানা ছাদ আছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা ফিরে গিয়েছিলাম। সেদিনের প্রাক্সন্ধ্যের মুষলধার বৃষ্টিতে ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করা যায়নি, যোগিনী মন্দিরের ছবিও তোলা হয়নি।

বিভিন্ন উৎস থেকে আমাদের দেশে যোগিনী মন্দিরের সংখ্যা পেয়েছি চার থেকে চোদ্দর মধ্যে। তবে সংখ্যার বাইরেও এই

মন্দিরের অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং মনোগ্রাহী বিশেষত্বগুলি আমাকে হতবাক করে। হিন্দুধর্মে যোগিনী নারীশক্তির প্রতীক। অসুর বধের সময় দেবী এদের সৃষ্টি করেছিলেন। সংখ্যায় চৌষট্টি যোগিনী বা আট মাতৃকা দেবীকে সর্বক্ষণ পরিবেষ্টিত করে রাখে। যোগিনীরা নৃত্যরতা অবস্থায় সর্বদা বৃত্তাকারে শূন্যে ভেসে বেড়ায় বলে মন্দিরগুলি সবসময় প্রতিষ্ঠিত হয় উঁচু স্থানে, আকারে গোলাকৃতি হয়, ওপরে আচ্ছাদন থাকে না এবং খোলা আকাশের নীচে থাকে। সুদূর অতীতে যোগিনীদের পূজো হলেও আজ থেকে পাঁচ-সাতশ বছর আগে সেই পূজো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রায় আটশ বছর আগে রাজস্থানের কাচ্চাপাঘাটা অঞ্চলের তদানীন্তন রাজপুরুষেরা এই অঞ্চল দখল করে। সেই বংশের পারদর্শিতা ছিল মন্দির তৈরির স্থাপত্যে, পাথরের ওপর খোদাইয়ের এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের কাজে, বিনা গাঁথুনিতে বিশাল বিশাল আকৃতির পাথরের কাঠামো তৈরি করায়। মিতাওলির এই মন্দির তৈরি হয়েছিল কাচ্চাপাঘাটা রাজা দেবপালার সময় তেরশ খ্রীষ্টাব্দে, অঙ্ক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। অনেকের মতে আমাদের পার্লামেণ্ট হাউসের (সদ্য অতীতের) স্থাপত্যের নক্শা তৈরির সময় আরকিটেক্টরা মিতাওলির এই মন্দিরের স্থাপত্যের কথা মাথায় রেখেছিলেন। জানতে পারলাম এখানকার সে সুস্থাপত্য ভুমিকম্প প্রতিরোধে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে।

দিনশেষে গোয়ালিয়র ফিরে যেতে যেতে ভাবছিলাম যেসমস্ত জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি সেগুলোর মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে গিয়ে ভালো লেগেছে। সেই জায়গাগুলোতে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এর

বাইরেও এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে গেলে, সামান্য একটু সময় কাটালে নিজেকে খুব তৃপ্ত মনে হয়। গোয়ালিয়রের বাইরে, মোরেনার গা ছমছম করা চম্বলে এক বর্ষার দিনে আমরা এইরকম তিনটি জায়গা দেখে তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

১৪/০৯/২০২৫

(সহযোগী লেখিকা সঙঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়)

*****

ইচ্ছে কাহিনী

ইচ্ছেরা সব একলা চলে
নিজের মনে একলা চলে।
সারাদিনের ইচ্ছে জমা
একটা একটা ইচ্ছে জমা।

ঘরের ভেতর পালঙ রাখা
পালঙ নীচে বাক্স রাখা।
রোজ জীবনের কাজ পড়ে না
ভেতরে তাই আলো পড়ে না
নিকষ কালোয় ভরা থাকে।
তার ভেতরে ইচ্ছে থাকে
তন্দ্রা মেদুর অবশ থাকে।

সূর্য্য ঢলে অস্তাচলে।
পোকামাকড় কেটেই চলে।
ইচ্ছেগুলো শুকিয়ে যায়
একে একে সব মরে যায়
ইচ্ছেমালিক সব ভুলে যায়।

একটা দুটো বাঁচার আশে
শেষবিকেলে বেরিয়ে আসে।
অস্তসূর্য্য চমকে ওঠে
আফসোসেতে মুচড়ে ওঠে।

ইচ্ছেগুলো কাছেই ছিল
কাছে থেকেও দুরে ছিল।
তাদের মধ্যে দুএকটা
হাল ছাড়ে না শেষ দেখাটা।
উভয়পক্ষ করে ঠিক
একটু এদিক একটু ওদিক।
দুপক্ষের আপস হয়
দুএকটাই পূরণ হয়।

ইচ্ছে বড় মজার জিনিস
চলতে ফিরতে জমতে থাকে।
গোধূলিবেলায় হিসেব দেখো
বাক্সবন্দী পড়েই থাকে।

১১/০৪/২০২৫

*****